Ghumpahari Aator

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

ঘুমপাহাড়ি আতর

গার্গী ভট্টাচার্য

মেরিন অফিসার নাস্তিক কাকুকে---

যিনি ১৯৯১ সালে সাউথ চায়না সি-তে এক জাহাজ দূর্ঘটনায়

নিঁখোজ হন এবং এখন মঙ্ক হয়ে এক মনাস্ট্রিতে আছেন-----

এই বইতে আমি নিজের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের কথা লিখেছি যাঁরা আমার নিজ চোখে দেখার বাইরেও, অস্তিত্ব হয়ে আমার সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে আছেন । অনেক জায়গার কথা আমি লিখেছি যেগুলি মিথিক্যাল । জগতে এরকম জায়গা সত্যি আছে ; তবে আমার ক্ষেত্রে এগুলি মানস ভ্রমণ ।

কিছু স্বপ্নের কথাও আছে যা আমার নিত্য সাথী ।

ঘুমপাহাড়ি আতর কেবল একটি বই নয় এটি ম্যাজিক রিয়লিজম্ এর ওপর ভিত্তি করা বিহরণ আলেখ্য ।

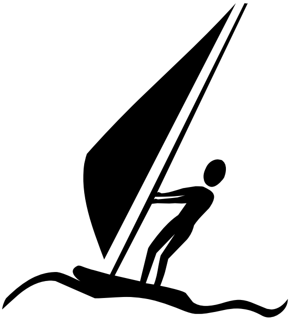

আমি তো এখানে গাড়ি চালাই না কাজেই আমার সবসময় একজন সারথীর দরকার হয় । আমার পতিদেব সদাব্যস্ত । কর্পোরেট জগতের কেজো মানুষ বলেই সময় কম । বাড়িতে সোফায় শুয়েও চলে আন্তর্জাতিক মিটিং !

তাই আমি এমন একজন সারথীকে খুঁজে বার করেছি যে আমাকে কখনই নিরাশ করবে না কারণ তার কোথাও যাবার তাড়া নেই ।

এই মানুষটিকে আপনারা সবাই চেনেন । যদিও আপনারা একে চেনেন এক দুরাত্মা বলে কিন্তু আমার ভুবনে এই ব্যাক্তি পরম আপন, সহজ সরল এক মানুষ !

আর রহস্য নয় ! এর নাম শুনে চমকে ওঠার কোনো কারণ নেই ! নাম হল----শকুনি ।

হ্যাঁ , ঠিকই ধরেছেন । মহাভারতের- কৌরব কূলের উপদেষ্টা শকুনি ।

আমি ওকে সুকু বলেই ডাকি !

সুকু আমাকে ড্রাইভ করে নানান জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যায় । শুরু হয় ক্যানবেরা শহর দিয়ে । পাহাড়ে ঘেরা অপরূপ শহর, অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা । আমি আগে মেলবোর্নে ছিলাম । মেলবোর্ন আমার এত ভালোলাগতো না । ওখানে একটি বড় দক্ষিণী মন্দির আছে সেই পুণ্যভূমি ব্যাতীত মেলবোর্ন আমার তত প্রিয় ছিলো না । আমি সমুদ্র সৈকতে থাকতাম । জাহজের যাওয়া আসা , সিগাল পাখির খেলা আর জেটিতে সূর্যাস্ত দেখে দেখে সময় কেটে যেতো । এখন আমি পাহাড়ে থাকি আর সারাটা জীবন পাহাড়েই থাকতে চেয়েছি ! কলকাতায় কৈশোর কেটেছে । ভাবতাম বড় হয়ে দার্জিলিং অথবা কালিম্পং-এ চলে যাবো ।

বিয়ে হবার পরে ভেবেছিলাম উটি কিংবা কোদাইকানালে থাকবো । সেও হলনা । কিন্তু আমার এত ইচ্ছে ছিলো বলেই হয়ত এখন ক্যানবেরাতে এসে পৌঁছেছি যা কিনা এক পার্বত্য এলাকা । এখানে পাহাড়ে -------

------Flamingo বসে !

উঁচু উঁচু নীল , গাঢ় সবুজ আর মেটে পাহাড় । আমি যেই পাহাড়ে থাকি সেখানে আসতে হলে অন্য পর্বত পেরোতে হয় । সাঁঝবেলায় ঢালু পথ বেয়ে নামতে নামতে দেখা যায় দূরের পাহাড়ে আলোক মালা ।

শকুনি আর আমি উদাস চোখে চেয়ে দেখি ।

শকুনির সময় তো ইলেক্ট্রিক ছিলো না কাজেই সেও মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে । আর আমি দেখি অর্ধমাতাল হয়ে । কারণ অল্প সুরাপান করে এসেছি একটি ওয়াইন শপ থেকে । মদিরাবতী আমি , সবুজ রূপ রস পান করে ।

আমার বাড়ি থেকে কিছু মাইল দূরে ঘন অরণ্য । সুকু আমাকে সেখানেও নিয়ে যায় । ক্যাঙারু , ঘোড়া, লোমশ ও লোমহীন ভেড়া , কোয়ালা (আজব জীব) , রং বেরং এর পাখি যেমন গালা -Galah , টিয়া , পেট মোটা হংস , মাছরাঙা , Scarlet Macaw ,ময়না ইত্যাদি আছে । উড়ে বেড়ায় ।

একটি ছোট নদী পার হয়ে যাই । বেশ ঘন্টাখানেক চড়াই উৎরাই ভেঙে গেলে দেখা যায় একটি মাঝারি আকারের নদী । প্রবল বেগে ধাবিত পাহাড়ি জলরাশি, এই নদীতে মিশেছে । লোকে এখানে ট্রেকিং করে । নদীর পাড়ে গাড়ি বা সাইকেল রেখে ওরা পায়ে হেঁটে উঠে যায় অন্য পাহাড়ে । আমি আর সুকুও যাই ।

তার আগে নদীর ধারে, বনপথে দাঁড়িয়ে সেঁকে নিই মাংস । কাঠকুটো জড়ো করে , কোয়েল পাখি কিংবা বনমোরগের ছাল ছাড়িয়ে তাতে তন্দুরি মশলা মাখিয়ে গনগনে আগুনের তাপে পুড়িয়ে নিয়ে খাই । গন্ধরাজ লেবু, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মূর্গির ঝোল রেঁধে খাই অথবা কাঁঠাল পেড়ে নিয়ে , গ্রেট করে -বাড়ি থেকে আনা চিংড়ি মাছের সাথে বেশি তেল দিয়ে রসুন কুচি, আদা ও পেঁয়াজ সমেৎ ভেজে খাই । ডেন্‌জার জোনে বসে ।

যেন অন্যপাশে, বুনো পশুর ভয়ে, বন্দুকবাজ দাঁড়িয়ে আমাদের পাহারা দিচ্ছে !

মাটির হাঁড়িতে রান্না হয় । আকাশ ও সবুজের নিচে ! কলাপাতায় মাংসের টিক্‌কা খাই আমি- লেবানীজ রুটি দিয়ে । এখানে ভারতীয় বহু দোকানে কলাপাতা কিনতে পাওয়া যায় । আর আমার লেবানীজ রুটি খুব ভালোলাগে । অপূর্ব একটা গন্ধ পাই ওতে ।

আমার মেলবোর্নের পড়শী ছিলেন এক লেবানীজ মহিলা । আমি যে স্তবক গল্পটা লিখেছি , ময়ূরকন্ঠী বল্কল বইতে আছে ঐ গল্প- সেই গল্পের ঘটনা ঈষৎ সত্য । আমাদের বেডরুমের পাশেই গুলিবিদ্ধ হয় এই মহিলার বড় ছেলে । অনেক রাতে, গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি যে একজন মহিলার গলার স্বর : ও হাবিবি , ইয়া আল্লাহ্‌ !

তার আগের দিনই পুলিশ একটি উগ্রপন্থী গ্রুপকে শনাক্ত করে কাজেই আমি ভাবি যে এবার আমাদের বাড়ির পাশে রেড হচ্ছে ।

এরপর পুলিশের গাড়ির শব্দ ।গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে মিস্টার খালেদ ! মেলবোর্ন ডক এরিয়া কাজেই মাফিয়াও আছে , নানান গ্রুপ আছে ।

আমরা মেলবোর্ন ছেড়ে চলে আসি ক্যানবেরা । আমার পতিদেব অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্সে কাজ করেন এখন ।

সে যাইহোক্ , ঐ পাশের বাড়ির মহিলাই আমাকে লেবানীজ রুটি খেতে শিখিয়েছিলেন । উনি নিজে হাতে আমাকে ঐ রুটি তৈরি করে খাওয়ান ।

ওর স্বামী থাকেন লেবানন-এ । এখানে মোট নয়-দশটি সন্তান নিয়ে একা থাকেন । সবাই বড় ও বিবাহিত একটি দুটি ছাড়া ।

একটি মেয়ের বিয়ে হল আমাদের চোখের সামনেই । সে লোকের চুল কেটে দেয় । বিয়ের পরে একটি জিমের ইন্সট্রাক্টর হল । সেই জিম একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে । মাত্র কিছু সংখ্যক মানুষ সেখানে বাস করে । বেশিরভাগই আসে বাইরে থেকে । অর্থাৎ ভ্রমণার্থী । তারা স্পা এর জিমে দেহ-চর্চা করে থাকে । কাজেই মেয়েটি ওদের ব্যায়ামে সাহায্য করে ।

শুনলে অবাক লাগে যে মেয়েটি একজন গ্র্যাজুয়েট ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার ।

চাকরি না পেয়ে চুল কাটার কাজ করতো । পরে ট্রেনিং নিয়ে জিমে যোগ দেয় । তবে পরিবার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে বলে ওর মা খুব দু:খ করতো । পরে ওর স্বামী ঐ দ্বীপে গিয়ে এক কাফে খোলে । সেখানে লেবানিজ ও তুর্কি খানা পাওয়া যেতো ।

আরেক মেয়ে তার নাম মিনি, সেই মিনি নামক তরুণী অ্যাফ্রিকায় গিয়ে বনে জঙ্গলে থেকে ওদের গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে আজব সমস্ত রান্না শিখে এসেছে আর একটি অ্যাফ্রিকান কাফে খুলেছে । ওর স্বামী এক অ্যাফ্রিকান মানুষ । নাম টম আজুলো । সে আগে হাসপাতালে কাজ

করতো । মানুষের সার্জারি হবার সময় যারা হার্ট, লাং মেশিন চালায় সেইসব কাজ করতো । বলে : আমাদের দেশের ডক্টরদের হাতও খুব ভালো । ওরাও দক্ষ । তবে কমপ্লিকেশান হলে ওদের কাছে প্রথম বিশ্বের মতন সুবিধে না থাকায় বহু লোক মারা যায় ।

এই ব্যাক্তি আবার নাকি মিডিয়ামদের কাছে যায় । স্পিরিট আর্ট করায় । অনেক রুগী, যারা ওর চোখের সামনে মারা গেছে তাদের ডাকে ।

স্পিরিট আর্ট হল এই যে- মিডিয়ামদের ওপরে আত্মা ভড় করে আর নিজের ছবি আঁকায় । পার্থিব জগতের ছবি ।

মিডিয়াম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আঁকায় পারদর্শী হন না । তবুও নিঁখুত ছবি আঁকা হয়ে যায় অচেনা মানুষের ।

টম আজুলো এখন এক সাইকিকের কাছে কাজ করে কারণ হাসপাতালের কাজ খুব স্ট্রেসফুল , রোজ মৃত্যু দেখতে হত আর সুপার বাগের ভয়ও ছিলো । এক রুগীর হাত ও পা কাটা পড়েছে সুপার বাগের জন্য- প্রাণ বাঁচাতে । সে ভর্তি হয় পেটে অপারেশানের জন্য । কিন্তু সুপারবাগের আক্রমণে হাসপাতালেই হাত ও পা ফেলে দিয়ে আসতে হয় ।

ভীষণ ভয় লাগে আজুলোর । তাই অন্য ফিল্ডে এখন । মৃত্যু হয়ে গেলে যাদের কাছে লোকে আসে সেইসব মানুষ আজুলোর সখা এখন ।

ও নিজে তো সাইকিক নয় কিন্তু এইদিকে আগ্রহ থাকায় এখন অফিস ওয়ার্কস্ করে । কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ওর ! কত কিছু দেখেছে । অনেক মৃত রুগী নাকি এসে বলেছে যে মারা গিয়ে তার ভালই হয়েছে । এখন ভালো আছে । অসুখে খুব কষ্ট পেয়েছে । ভুগেছে ।

শকুনি বললো যে একটি দেশের কথা সে জানে যেখানে এক চিকিৎসক মেয়েদের জোর করে জরায়ু অপারেশান করিয়ে দিতো । কারণ এতে মোটা টাকা ফিজ হিসেবে মেলে । কোনো মেয়ে যদি রাজি না হত তাহলে পরে তার মুখে অ্যাসিড মারা হত । অর্থাৎ সে নিজের নারীত্ব বজায় রাখতে চাইলেও মুখের এমন অবস্থা করে দেওয়া হত যে আর কোনোদিন ঐ নারীত্বের কেউ মূল্য দেবেনা ।

আমি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জানতে চাই যে এই পরামর্শটি সুকুই ঐ চিকিৎসককে দিয়েছিলো কিনা !

সে হেসে ফেলে। তারপর বলে ওঠে : এখন এমন দিন এসে গেছে যে আমার সবচেয়ে বাজে পরামর্শটাও তোমাদের কাছে সৎ উপদেশ বলেই মনে হবে । আর আমি তখন এই পরামর্শ ইচ্ছে করেই দিতাম যাতে কৌরব বংশ ধ্বংস হয়ে যায় ।

শার্লক হোম্‌স ,ফেলুদা , ব্যোমকেশ বক্সী অথবা কপালকুন্ডলা আমার কাছে কোনো চরিত্র নয় । জীবন্ত মানুষ । এরা নেই এই সত্য হজম করা আমার পক্ষে অসম্ভব । তাই হয়ত শকুনি আজ বাস্তবে নেমে এসেছে আমাকে স্বস্তি দেবার জন্যই !

কিছুদিন আগেই আমার লাং সার্জারি হয়েছে । এবার একটি অর্গ্যান বাদ চলে যাবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি । হাসপাতালে আমি খুব ভালো ছিলাম । সেখানে আমার রাত্রের নার্স , ধরা যাক্ তার নাম ফরজানা তো সেই মেয়েটি আমার বাড়ির কাছেই থাকে । ওদের পাড়াটা অন্য পাহাড়ে ।

আমাদের পাহাড় থেকে একটি সরু পথ অন্য পর্বতের বুক চিরে চলে গেছে ওদের পাড়ায় । ধরা যাক্ ওদের পাড়ার নাম রিভার । সেখানে একটু বেশি জঙ্গল আছে । সবুজ বনানী ভেদ করে সুদৃশ্য নানান কটেজ । কোনোটা কমলা , কেউ গাঢ় বাদামী আর কেউবা ধূসর রং এর ।

কিছু ছোট দোকান আছে ঐ এলাকায় । একটি ক্ষুদ্র পোস্ট অফিস ।

আর চওড়া রাস্তা বা ওয়াকিং ট্রেল । পাশেই কলস্বনা জলরেখা !

নানান আকৃতি ও রং এর মানুষ নিজেদের পোষা জন্তু নিয়ে ঐ পথে হেঁটে যায় । এরকমই এক দুপুরে **Wombat** আক্রমণ করে এক মহিলাকে । তার দুই কুকুর আক্রান্ত হয়ে লড়াই করে । শেষে কিছু পথচারী ঐ মহিলাকে বাঁচায় ।

Wombats are-short-legged, muscular quadrupedal marsupials that are native to Australia. They are about 1 m (40 in) in length with small, stubby tails. There are three extant species and they are all members of the family**Vombatidae**. They are adaptable and habitat tolerant, and are found in forested, mountainous and heathland areas of south-eastern Australia, including Tasmania----wikipedia.

মনে পড়ে যায় আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালীন শুনতাম যে আমাদের বাড়ির কাছেই বানেরঘাট্টা অরণ্যের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে যেসব দরিদ্র মানুষেরা বসবাস করতো ওদের কাউকে হাতি পিষে মেরে ফেলেছে । কেউবা হাতির ; বাচ্চা-হাতি প্রসব দেখতে গিয়েছিলো বনের কাছে । সেখানে পদপিষ্ট হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে । কাজেই দেখা যায় যে পশুরা সব জায়গাতেই একটু রাগী টাইপস্ । সে ভারতীয় হাতিই হোক্ অথবা ওম্বু মানে ঐ ক্ষুদ্র সাইজের গন্ডার বা ভল্লুকের মতন পশু ।

কাজেই আমি যে একটি সাংঘাতিক জায়গায় থাকি সেটা পাঠক নির্ঘাত বুঝতে পেরে গেছেন । ওম্বু নাকি একবার ধরলে ছাড়ে না । খুবলে নেয় যা কিছু গোপনীয় ! কাজে কাজেই । কখন ওর মাথায় কী চাপে কে বলতে পারে ? অরণ্য পথে সেই কারণেই হয়ত ট্রেকিং বেশ রিস্কি ।

আমি মাঝে মাঝে অবশ্যই ঘন বনে যাই । ওখানে আমার বন্ধুরা আর শকুনি , সবাই মিলে গোটা চিকেন (পিস করা নয়) দিয়ে বিরিয়ানি বানাই বেশ জংলী এস্টাইলে । সেই চিকেনগুলি তুলে নিয়ে অল্প ভাত সহযোগে খাই জঙ্গল -মহলে বসে । ওম্বু এখনও ধরেনি আমাদের তবে ক্যাঙারু এসে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গেছে । আমার বাড়ির সামনের বাগানে ক্যাঙারু আসে । হয়ত রোদ পোহায় ! ওরা আবার গোধূলিতে রাস্তা পার হয় । কখনো কখনো দিন দুপুরে ওদের দেখা যায় । খেলছে নিজেদের মধ্যে । লাফিয়ে , ঝাঁপিয়ে ।

হয়ত বা ঐ ক্যাঙারুগুলির ঘুম আসেনা । অনেক মানুষের মতন । তাই দুপুরে লাফিয়ে কাটায় । ভেড়ার দল লোম ছেঁটে আসে একটা সময় ।

আমার বাড়ির কাছেই আছে বড় বড় ফার্ম । সেখানে ভেড়া , শূকর - পালে লোকেরা । ফ্যালো ডিয়ার নামক একজাতের হরিণ আসে । ক্ষেতের আলু খায় । এখানে অনেক ধরণের আলু পাওয়া যায় ।

নীল আলু, সোনালী আলু, রোস্টের আলু , গোলাপী আলু আর বিশেষ উপায়ে সৃষ্ট আলু যা ব্লাড সুগারের রুগীরাও ভক্ষণ করতে সক্ষম !

এখানে একটি চৈনিক পরিবারের সাথে আলাপ হয়েছে যারা একটি ফার্ম চালায় । ওরা ফার্ম বিক্রি করে নিজ দেশে চলে যাবে । আমার এক বান্ধবী বিল্ডিং অ্যান্ড পেস্ট ইন্সপেক্শান করে । আমি ওর সাথে ঐ প্রপার্টি দেখতে যাই । সেখানেই নানান কথা হয় । আমি নিজেও পেস্ট ইন্সপেক্টরের কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম । কিন্তু কোর্সটা করিনি । আবার ফিউনেরাল ডাইরেক্টর হবার জন্য কোর্স করতে যাই । কিন্তু আমার হেলথ্ ভালো না থাকায় কোনোটাই আর করা হয়নি ।

ফিউনেরাল ডাইরেক্টরের পদে আমি বেশ ভালো মানাতাম । যেহেতু আমি নিজে মিডিয়াম তাই আত্মাদের সাথে সহজেই যোগ-স্থাপন করতে পারতাম । তাই শুধু দেহটির সৎকার নয় , মৃত সত্ত্বার ব্যাথা ও আত্মীয় পরিজনকে দিতে চাওয়া মেসেজ আমি অতি সহজেই তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম । আমার স্বামী আমাকে কোনো কিছুতেই বাধা দেননা ।

এটা আমার ভালোলাগে । আমি কাগুজে বাঘ হলে উনি আমার সাহসী রিং মাস্টার ।

এখানে আমি মিডিয়ামশিপ নিয়ে কিছু লিখতে চাই । ঐ ফার্মের চৈনিক মালিকের একটি সারমেয় ছিলো তার নাম বনবন । আদরের বনবনি ।

বনবনি একদিন ল্যাংচাতে শুরু করে । তারপর জানা যায় কোনো দুরারোগ্য অসুখে সে আক্রান্ত । একদিন অকস্মাৎ মারা যায় ।

এরপরে বনবনি আমাকে এসে বলে যেন আমি ঐ চৈনিক পরিবারকে জানাই যে সে এখন ভালো আছে । গুড হ্যান্ডস্ এ আছে ।

আমি ওদের গিয়ে জানাই । তারপর থেকে আমার কাছে মিডিয়াম বলে নানান অনুরোধ আসতে থাকে বিভিন্ন আত্মার সাথে যোগ স্থাপণ করার জন্য । মিডিয়ামদের অনেকে বাস্টার্ড বলে । কিন্তু স্পিরিট যখন এসে ধরে তখন সবার আগে নিজেকে বাঁচাতে শিখতে হয় । পেশা ও নেশা পরে আসে । সেটা ঐ নেমস্ দেওয়া মানুষের দল বোঝেন ?

ওদের কোনো স্পিরিট ধরে না বলে তাই না ?

র‍্যাশনাল হওয়া মানে সবকিছু অনুসন্ধান করা । তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া নয় । আর ব্যাড মিডিয়াম কিংবা সাইকিক যেমন আছে সেরকম ব্যাড সায়েন্টিস্টও বহু আছে দুনিয়াতে । বিজ্ঞানের একটা মুখোশ পরে নিলেই কোনো শর্মা Messiah হয়ে যায়না । জগতে তিন ধরণের মানুষ আছে । গুড, ব্যাড আর ইভল্ । তার সাথে কারো প্রফেশান অথবা সেক্সুয়াল ওরিএন্টেশান যুক্ত নয় কোনোভাবেই । সমস্ত ফিল্ডে সৎ ও শুদ্ধ মানুষেরা থাকেন । সব জাতি ও উপজাতির মধ্যে বলেই আমি মনে করি ।

ফক্স বোনেরা স্পিরিচুয়ালিজমকে সাধারণ মানুষের মধ্যে চালু করেন । তিন বোন মার্গারেট , কেট ও লিয়া মিলে এই মিডিয়াম প্রথা চালু করেন যা পরে লোকপ্রিয় হয় । তার আগেও অবশ্য এই আত্মা আনার প্রথা ছিলো । মানুষ জানতো আত্মার অস্তিত্বের কথা । ফক্স বোনেরাই পরে আবার বলেন, তা সে অনেকদিন বাদে যে তাদের কাজের বেশ কিছুটা অংশই ভুয়ো । লোকঠকানো । তবুও স্পিরিচুয়ালিজমের জনপ্রিয়তা কমেনি । তার প্রমাণ দেয় আমেরিকার লিলিডেল শহরটি । এটি মিডিয়ামদের মক্কা ।

অংকের মক্কা যেমন প্রিন্সটন সেরকম মিডিয়াম ও সাইকিকদের মক্কা এই লিলিডেল । সবাই একবার ওখানে যেতে চান । নিউ ইয়র্কের এই শহরটি বাফেলো থেকে এক ঘন্টা দূরে । এখানে মিডিয়ামদের ট্রেনিং , সেমিনার হয় । প্যারানর্মাল নিয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁরাও এখানে আসেন । বড় বড় সাইকিক ও মিডিয়াম এখানে লেকচার দেন । আসেন স্পিরিচুয়াল গুরুরাও । যেমন আমাদের ভারতের ডাঃ দীপক চোপড়া ।

Lily Dale was incorporated in 1879 as Cassadaga Lake Free Association, a camp and meeting place for Spiritualists and Freethinkers. The name was changed to The City of Light in 1903 and finally to Lily Dale Assembly in 1906. The purpose of Lily Dale is to further the science, philosophy & religion of Spiritualism.

Lily Dale is a hamlet located in the Town of Pomfret on the east side of Cassadaga Lake, next to the Village of Cassadaga. Located in southwestern New York State, it is one hour southwest of Buffalo, halfway to the Pennsylvania border. Lily Dale's year-round population is estimated to be 275. Each year approximately 22,000 visitors come for classes, workshops, public church services and mediumship demonstrations, lectures, and private appointments with mediums. In recent years, guest lecturers have included Lisa Williams, Dee Wallace, members of "Ghost Hunters," Tibetan monks, James Van Praagh, Dr. Wayne Dyer, and Deepak Chopra……FROM WIKIPEDIA

বহু দক্ষ সাইকিকের দেখা মেলে এখানে যাঁদের কাছে আধিভৌতিক ও ভৌতিকতা হল জীবনে বাঁচার রসদ । বিদেশে এই বেশ সুবিধে । সাইকিকরা সম্মান ও কাজের সুযোগ পান ।

আমাদের দেশে তো এঁদেরকে এক ঘরে করে রাখা হয় । অনেক সময় পাগল আখ্যা দেওয়া হয় । বিদেশে এঁদের নিজেদের কমিউনিটি আছে । এঁরা প্রথাগত ধর্মে আস্থা রাখেন না । তার কারণ হয়ত মেনস্ট্রিম খ্রীস্টানিটি এঁদেরকে ব্যঙ্গ করেন ।

বলেন যে-- যীশু বলে গেছেন মৃত আত্মাকে না জাগাতে অথচ এইসব সাইকিক-মিডিয়ামেরা সেটাই করে থাকেন ।

যীশু সত্যি কি বলেছেন আর এইসব চার্চের কর্ণধারেরা কি প্রচার করছেন তা ভাবার বিষয় । মিডিয়ামরা আবার বলেন : হ্যাঁ , আমরা মৃতদের ডাকি কিন্তু যিসাস কি এখনও বেঁচে ? উনিও তো মৃতই ! তাছাড়া আমরা পাদ্রীদের মতন কচি কচি শিশু ধরে, মলেস্ট করিনা ।

“The kingdom of God is within you”---মহাবাণী । খ্রীস্টানদের । আবার নিচের লেখাটি পড়লে বোঝা যায় ধর্মের প্রকৃত অর্থ ।

INTERNET :::: This inner treasure of life has had many names. Plato refers to it as *the Good* and *the Beautiful*, Aristotle as *Being*, Plotinus as *the Infinite*, St. Bernard of Clairvaux as *the Word*, Ralph Waldo Emerson as *the Oversoul*. In Taoism it is called the *Tao,* in Judaism *Ein Sof*. Among Australian aborigines it is called the *dreamtime*, among tribes of southern Africa- *Hunhu/Ubuntu*. The names may differ, but the inner reality they point to is one and the same.

In every case, it’s understood that this inner, transcendental reality can be directly experienced. This

experience has likewise been given different names. In Indian traditions it is called *Yoga(Moksha),* in-buddhism-*Nirvana*,in Islam *fana* ,in Christianity *spiritual marriage*. It is a universal teaching based on a universal reality and a universal experience.(INTERNET)

এই ইনার সেল্ফই ঈশ্বর ।কাজেই আত্মা যারা , তারাও সেই সেল্ফেরই অংশ । পরমহংস যোগানন্দের আন্তর্জাতিক বেস্ট-সেলিং বই অটোবায়গ্রাফি অফ আ ইয়োগীতে আছে যে ওঁর গুরু শ্রী যুক্তেশ্বর গিরি মারা যাবার পরেও ওঁর কাছে ফিজিক্যাল বডি ধারণ করে এসেছিলেন । বলেছিলেন যে উনি এখন অ্যাস্ট্রাল দুনিয়ায় আছেন অ্যাস্ট্রাল বিং-দের অ্যাস্ট্রাল কর্ম থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিয়ে ।

এই অ্যাস্টাল দুনিয়া কি ?
যেখানে মানুষ মরণের পরে যায় ।
তারও পরে আছে মেন্টাল বা কসাল দুনিয়া বা প্লেন ।

Astral এ বসে আত্মারা নানান ইন্টেলেকচুয়াল , ক্রিয়েটিভ ও স্পিরিচুয়াল থিওরি ভাবেন ও প্রয়োজনে ধরিত্রীতে দিয়ে যান । এই যে এত বড় বড় বিজ্ঞানী , শিল্পী , কবিরা আছেন কিংবা সাধকেরা এঁরা সবাই মৃত্যুর পরে ঐ সমস্ত প্লেনে থাকেন যতদিন না নব জন্ম নিচ্ছেন । অবশ্যই যদি উত্তম পুরুষ হন । ওখানে শুধু থটস্ -ভাসে । দেহ আলোক রশ্মির মতন । ওঁরা লাইট বিং-স । আলোর জগতের বাসিন্দা । অসৎ কর্ম করলে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় । তখন নিচু প্লেনে যাবে । যাকে বলে নরক ।

এগুলি লেখার উদ্দেশ্য হল এই যে মৃতেরাও জীবিত । স্বয়ং যুক্তেশ্বর গিরি ছিলেন বোধিসত্ত্ব-Arihant । এনলাইটেন্ড বিং । তাঁর কথা অসত্য নয় । অথচ চার্চের পাদ্রীরা যেই বিধান দিচ্ছেন তা এর বিরুদ্ধে । মৃত মানুষকে জাগিও না ঘুম থেকে । দুটি জন্মের মাঝে মানুষ ঘুমায় । কিন্তু সত্যি কি তাই ? পরমহংস যোগানন্দের বিখ্যাত বই অটোবায়োগ্রাফি অফ আ ইয়োগিতে লেখা আছে যে যোগানন্দজী নিজের মৃতা মায়ের সাথে যোগাযোগ করেন- যিনি স্পিরিট দুনিয়ায় ছিলেন ।

যুক্তেশ্বর গিরি ও আরো অনেক সাধকদের কথা অনুযায়ী মানুষ শুধু দেহ রাখে । আত্মা মরেনা । অর্থাৎ চেতনা থেকেই যায় । নানান জন্মের পরে আস্তে আস্তে বিলিন হয়ে যায় ব্রহ্মে যা স্বয়ম্ভূ । সুপ্রিম চেতনা । সুপার কনশাসনেস । কাজেই এই আত্মার নিবাস অ্যাস্ট্রাল দুনিয়া কিংবা মেন্টাল / কসাল দুনিয়া ।

চার্চের মানুষ দেখেছেন যে মিডিয়ামের ডাকে আত্মা আসে । সুতরাং সেটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না । তাই ওরা বলছেন যে ওগুলি আত্মা নয় দানব । আত্মা সেজে , মৃত আত্মীয় সেজে চলে আসে লোকের ক্ষতি করতে । কিন্তু এই তথ্য অসত্য । বহু রাজা ও রাজপরিবার নানা যুগে চার্চকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির কারণে ব্যবহার করেছেন । পাল্টে দিয়েছেন বাইবেলের রি -ইন্কার্নেশানের চ্যাপ্টার নিজ পছন্দ অনুসারে । কাজে কাজেই ,আমার মনে হয় যে সাধুরা মৃতদের জাগাতে বারণ করেন কারণ তাতে ওদের সাথে অ্যাটাচ্মেন্ট বাড়ে । কিন্তু প্রতি আত্মার লক্ষ্য হল মোক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া । তাই আর যোগাযোগ বাড়িও না !

৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক মিডিয়াম আমাকে বললেন , চার্চের লোকেদের জিজ্ঞেস করো : হোয়াই ডু ইউ কল যিসাস? ইজ হি নট আ ডেড স্পিরিট ? আমরা পুলিশের মতন । কত মানুষের কত সুখদু:খ ,

অপরাধের জার্নাল আমাদের হাতে আসে স্পিরিট দুনিয়া থেকে । রেপ, মার্ডার , চাইল্ড সেক্স আমাদের খুবই পরিচিত শব্দ ।

আমাদের হিন্দু ধর্ম সেইদিক দিয়ে খুব লিবারাল । এখানে সাইকিক মিডিয়ামদের ঠাকুর হলেন কেতু । রাহু কেতুর এক অংশ কেতু ঠাকুর । যাঁদের জন্ম-কুন্ডলিতে কেতু খুব স্ট্রং হয় তারাই বড় সাইকিক ও মিডিয়াম হন কিংবা অকাল্ট বিদ্যা, গুপ্ত , গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী । আবার ভূত প্রেত পিশাচের দেবী স্বয়ং মা কালী এ কথা কে না জানে ?? সুতরাং আমরা চার্চের চেয়ে এইসব বিষয়ে অনেক সংবেদনশীল ।

এই কারণে কিংবা পারিবারিক মিলনক্ষেত্র গীর্জা , স্পিরিট হান্টারদের জায়গা নয় -বলে হয়ত স্পিরিচুয়ালিস্টদের মেনস্ট্রিম খ্রীস্টানিটি আলাদা করে রেখেছিলো ।

তাই হয়ত ওরা নিজেদের চার্চ বানান । যা স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চ নামে পরিচিত । এঁদের কেউ কেউ আবার খ্রীস্টানিটিতেই আস্থা রাখেন । কেউ কোনো ধর্মই মানেন না একেশ্বর বাদ ব্যাতীত ।

তবে সবাই প্রায় নিচের এই কথাগুলি মেনে চলেন ::

হায়ার পাওয়ারে বিশ্বাস , মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকে আর স্পিরিটদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব । অনেক খ্রীস্টান পাদ্রী বলেন : খ্রীস্টান মিডিয়াম বলে কোনো কনসেপ্ট নেই । দুটো একসাথে হয়না ।

স্পিরিট হান্টারদের গীর্জায় , পাদ্রী হন স্বয়ং মিডিয়ামরাই । ওরাও আমাদের গডকেই পুজো করেন, কসমিক ইউনিটি । স্পিরিট হিলিং দেন আত্মারা এসে অ্যাস্ট্রাল দুনিয়া থেকে । নানা জটিল ব্যাধি সেরে যায় প্রায় সাথে সাথেই । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা পার্থিব জগতে ছিলেন বড় বড় চিকিৎসক । অর্থাৎ মানুষের শরীর সারানোর বিদ্যায় বহু আগে থেকেই তারা পারদর্শী ।

নিউজিল্যান্ডে শুনেছি স্পিরিট হিলিং যদি স্পিরিচুয়ালিস্ট চার্চে দেওয়া হয় তাহলে মিডিয়াম কোনো অর্থ দাবী করেন না । ওটা তাঁদের এথিকসের বিরুদ্ধে ।

এছাড়াও আছেন শামামেরা । এরাও আত্মার সাথে যোগাযোগে সক্ষম । আগে তুর্কি ও মোঙ্গলদের মধ্যে এই শামামেরা ছিলেন আজ সারা দুনিয়ায় আছেন । আছেন নেপাল , সিকিম ও উত্তর ভারতে । এরা লাইট ও ডার্ক দুই ধরণের স্পিরিটদের সাথেই যোগ-স্থাপন করতে পারেন ।

তবে শামামই হন কিংবা মিডিয়াম , প্রত্যেকের থাকে হোয়াইট লাইটের ও স্পিরিট গাইডদের প্রটেকশান অর্থাৎ রক্ষাকবচ । কারণ সৎ আত্মা কিছু না করলেও অসৎ আত্মারা প্রভূত ক্ষতি করতে সক্ষম এবং প্রাণনাশ করতে । তাই প্রতিটি স্পিরিটের সাথে যোগস্থাপনই একদিকে বেশ রিস্কি । হাই লেভেল প্রটেকশান নিয়েই ওরা কাজে নামেন ।

আত্মারা আমাদের মতন । শুধু দেহটি নেই । ওদের দেহ সুক্ষ্ম । বায়বীয় । অ্যাস্ট্রাল বডি । অ্যাস্ট্রাল কণা দিয়ে তৈরি । কসমিক পার্টিকেল ।

আমার বাবা তো পার্টিকেল ফিজিসিস্ট ছিলেন । নাস্তিক । এখন নিয়মিত আমার সাথে যোগাযোগ হয় সাইকিকের মাধ্যমে ও আমার নিজের কমিউনিকেশানের মাধ্যমে । উনি হয়ত বুঝতে পারছেন মরণের পরের সিন । বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন কারণ সে তো এখন ওঁর নিজরূপ ।

আমি ইদানিং স্পিরিট কমিউনিকেশান করতে পারি । আত্মাদের সাথে যোগাযোগ হয় । তবে আমি দেখতে পাইনা । কথা হয় মনে মনে যাকে বলা হয় মেন্টাল মিডিয়ামশিপ । আর আমি স্পিরিটদের শুঁকতে পারি । ওদের ঘ্রাণ নিতে সক্ষম ।

আই ক্যান স্মেল স্পিরিট Clairalience (smelling)---------

এছাড়াও আছে ক্লেয়রভয়েন্স । ওখানে মিডিয়াম আত্মাদের দেখতে পান । কখনো তৃতীয় নয়নে , কখনো বা সামনাসামনি । ব্রেট ফ্যাভালোরো এইরকম এক মিডিয়াম । ব্রেট ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াম । আবার মণিকা মুলার বলে একজন বয়স্ক মিডিয়াম আছেন যিনি এখানে স্পিরিচুয়ালিস্ট মহলে শ্রদ্ধেয়া ও পূজিতা । উনি আত্মা দেখতে পান । মণিকার সাথে আমাদের কথা হয়েছে । ম্যান্সফিল্ড নামক একটি গ্রামে থাকেন উনি । ওঁর ছাত্রীর কাছেও গেছি । উনিও দেখতে পান । আরো কিছু মিডিয়ামদের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে যারা লিলিডেলে ঘুরে এসেছেন । আমার মিডিয়াম হবার কথা ওদের বলেছি । ভেবেছিলাম ওরা হাসবেন । কিন্তু নাহ্ । ওরা সবাই বলেছেন যে আমার কমিউনিকেশান হয় । আমি ন্যাচেরাল মিডিয়াম । ব্রেট ও ডন আমাকে কয়েকটি জিনিস শিখিয়ে দিয়েছেন কি করে স্পিরিটদের সাথে আরো ভালোভাবে যোগাযোগ করা যায় সেই ব্যাপারে । আমি নিশ্চিত যে আমি একজন মিডিয়াম । স্মল বা মিডিয়াম নয় একেবারে ফুল মিডিয়াম।

মিডিয়ামদের নানান এথিকস্ আছে । যেমন চিকিৎসকদের থাকে । ওরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন না । স্পিরিট যা মেসেজ দিচ্ছেন সেটাই শুধু বলবেন । নিজ চিন্তা কিংবা আরোপিত কথা ক্লায়েন্টকে বলবেন না । এছাড়া ওরা সব ধরণের জিনিস বলতে পারেন না । খুব বেশি পার্সোনাল জিনিস বলার নিয়ম নেই । তবে এথিকস্ ব্রেক করেন এরকম মিডিয়ামও দেখেছি । তবে সেটা ক্লায়েন্ট এর চাহিদার জন্য ।

আসলে আমার মা ছিলেন ন্যাচেরাল মিডিয়াম । শৈশব থেকেই আত্মা ভড় করতো । স্কুলে পড়তে নিজের থেকে হাত চলতো । পরে বাড়িতে লোক আসা আরম্ভ হয় --ভবিষ্যৎ জানতে ।

দিদু- মাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে এইসব করবেন না । মেয়ের বিয়ে দিতে অসুবিধে হবে । মা এইসব আত্মা নামানো বন্ধ করে দেন । পরে আমরা আর সেরকম কিছু দেখিনি । আমার হেমছায়া গল্পটা এই বিষয় নিয়ে লেখা । মা ছিলেন এক হিলার আদতে ।

আসলে তুষারকান্তি ঘোষ আমার মাতামহের ফার্স্ট কাজিন । ওঁদের বাড়িতে এইসব মিডিয়ামশিপের প্রথা ছিলো । মা হয়ত ওখান থেকেই এই ট্যালেন্ট পেয়েছিলেন ।

বাবা মারা যাবার পরে আবার শুরু হয় , নিজের থেকেই । মা তখন ভয় পেতেন একা কোথাও বসতে । আবার নিজে ২০১২তে মারা গেলেন । ক্যান্সারে ডান দিক অকেজো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানহাত দিয়ে লিখে ও এঁকে চলেছেন । সেই আত্মার কারণে । আমার ভাইয়ের স্ত্রী ঐসব কাগজ রেখে দিয়েছে । ও নিজে ইঞ্জিনীয়ার । আগে এইসব বিশ্বাস করতো না । শাশুড়ি মাকে দেখার পরে এখন করে । বলে : দিদি , আজব কান্ড । নিজ চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত ।

অনেক বিজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসায় আগ্রহী না হলেও বলে থাকেন যে আমরা প্রাকৃতিক বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করি । অপ্রাকৃত কিছু নিয়ে করিনা ।

আবার এক লজিক্যাল ব্যাক্তি একটি বিশেষ ক্যামেরা আবিস্কার করেন ।

এই বিশেষ ক্যামেরা দিয়ে আত্মার ফটো তোলা সম্ভব ।

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে যে ---**Kirlian photography** is a collection of photographic techniques used to capture the phenomenon of electrical coronal discharges. It is named after Semyon Kirlian, who in 1939 accidentally discovered that if an object on a photographic plate is connected to a high-voltage

source, an image is produced on the photographic plate.The technique has been variously known as "electrography", "electrophotography", "corona discharge photography" (CDP),"bioelectrography", "gas discharge visualization (GDV)", "electrophotonic imaging (EPI)", and, in Russian literature, "Kirlianography".

Kirlian photography has been the subject of mainstream scientific research, parapsychology research and art. To a large extent, it has been used in alternative medicine research. Kirlian photography has been a subject of scientific research, parapsychology research---
and pseudoscientific claims

আত্মারা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে ।

"Occult Symbology" - Symbolism is the language of the Mysteries (Internet)

অনেকে আত্মাদের শুঁকতে পারেন । অনেকে দেখতে পান , অনেকে শুনতে পান ওদের আওয়াজ । বিভিন্ন নাম আছে এইসব ক্ষমতার ।

Clairsentience (feeling/touching)

Clairaudience (hearing/listening)

Clairalience (smelling)

Claircognizance (knowing)

Clairgustance (tasting)

Clairvoyance (Seeing)

আমার মা সেইভাবে এই মিডিয়ামশিপ ক্ষমতা নিয়ে কোনো রকম কোনো প্র্যাকটিশ করেন নি । শুধু আত্মাদের সাথে যোগাযোগ হত।

ব্রেট বলেন: ইওর মাদার ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং মিডিয়াম।

স্পিরিটরা ডাকলেই আসে না। যদি ওদের মিডিয়াম কিংবা ক্লায়েন্টের প্রতি কোনোরকম ক্ষোভ ও ঘৃণা / অপ্রীতি থাকে ওরা আর আসে না স্পিরিট দুনিয়া থেকে যতই কাছের মানুষ হননা কেন। আসলে এখানকার সম্পর্কগুলি ইউনিভার্সাল নয়। কাজেই মৃত্যুর পরে মানুষ বা বলা ভালো আত্মা বদলে যায়। মনোগত ও ইমোশনাল দিক দিয়ে।

কেউ ভূত অর্থাৎ আর্থ বাউন্ড সোল ; যারা মৃত্যুর পর স্পিরিট দুনিয়ায় যায়নি---- কেউ বা স্পিরিট দুনিয়া থেকেই আসে।

ফিজিক্যাল মিডিয়ামশিপও হয়। যদিও আজকাল খুব কম এরকম মিডিয়াম দেখা যায়। আমাদের দেশে বলা হয় ভড় হয়েছে। এ হল সেই ভড় হওয়া, ভড়ং নয়। এক্ষেত্রে স্পিরিট এসে মিডিয়ামের শরীরের এনার্জি নিয়ে ঘরে ম্যানিফেস্ট করে। এই এনার্জিকে বলে এক্টোপ্লাজম। সেইজন্য ফিজিক্যাল মিডিয়ামগণ আঁধারে আত্মাদের দেখান।

Physical Mediumship is where the spirit world manifests to appear in physical form using the mediums life force (ectoplasm) to replicate themselves, so they become fully present in the room. Physical Mediumship allows the spirit to communicate directly to you with his or her own voice.

Ectoplasm is a key ingredient that spirit needs in order to make themselves “physical” in a séance environment. Every person has it in his or her body; it’s a life force medium and does have weight.
Spirit utilises large amounts of this substance which derives from the body of the medium and they use it to materialise in the-room.

Ectoplasm is extremely light sensitive, hence why séances are held in complete darkness. If exposed to any un-requested artificial light, it has the same effect as boiling water does on snow.

This has severe consequences for the medium, even though the spirit person is communicating independently from the medium, they are still attached to the medium because of the ectoplasm they are using.

Info : From Brett Favaloro's website .

আমি স্পিরিটদের সাথে কথা বলি । বহু প্রমাণ পেয়েছি যে যেই কথাগুলো আসছে সেগুলো সত্যি । বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিয়ে দেখেছি । হয়ত মায়ের ঐ ক্ষমতা আমার মধ্যে এসে গেছে । মা বলতেন : ওদের কেন ভয় পাস্? ওরা মানুষের মতনই এক একজন । শুধু দেহটা নেই ।

সত্যি কথা বলতে কি আগে ভূতে খুব ভয় পেতাম । এখন তেমন পাইনা । ওদেরকে বলি মনে মনে : বাছাধন থুরি ধনেরা -আমার বাড়িতে আছ বিনিপয়সায় , বিদেশে এরকম হয়না । খুব ভালো কিন্তু কাজ টাজগুলো করে দিতে পারো তো ! এই ধরো রান্নাবান্না কিংবা ঘরদোর সাফ অথবা জামাকাপড় গোছানো ।

ওঁরা যেন হেসে বলে ওঠে : অলস মেয়ের ঘরে থাকে অলস ভূত । যখন বেঁচে ছিলাম তখন অনেক কাজ করেছি এখন মরে গিয়েও কাজ করবো নাকি ? এখন শুধু এনজয় করবো । লেট্স্ হ্যাভ সাম ফান্ !

বলি : কী এনজয় করবে ? লাইফ ? তা লাইফ তো আর নেই ।

শুনে হেসে ওঠেন ওঁরা চকিতে । তারপর বলেন : কেন তোমার লাইফ তো আছে , আমরা তার সঙ্গেই এগিয়ে চলেছি , বাতাসের গতিতে । নবরূপের সন্ধানে । আমরা এখন স্পীডে যাই সব জায়গায় !

চৈনিক ঐ পরিবারের ছেলে নাম নিয়েছে অলিভার । ওদের তো খটোমটো সব নাম হয় কাজেই বদলে ওরা সাহেবী নাম নিয়ে নেয় ।

অলিভার এখানে আর্মিতে ছিলো । সৈনিক হিসেবে । বহু মৃত্যু দেখেছে । শেষে মানসিক রুগী হয়ে গেছে । খুব anxiety disorder এ ভোগে । এখন ফার্মেই কাজ করে । শস্যক্ষেতে কাজ আর ওদের ফার্মার্স মার্কেটে একটি দোকান আছে সেখানে সপ্তাহে চারদিন , বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত সবজি বিকিকিনিতে হেল্প করে । মাঝে মাঝে হরিণ শিকারে যায় । সেই হরিণ মেরে বাসায় এনে কাটে । তারপর রান্না করে খায় ।

গোটা হরিণকে শুইয়ে কেটে নেয় । দেখলে অবাক লাগে । তবে হরিণের মতন নিরীহ জীবকে মেরে খেয়ে ফেলা এটা একটু পীড়া দেয় ।

মাইনিং এর কাজ নিয়ে একটু ভালো করে বাঁচবে বলে এখানে আসে ওদের পুর্বপুরুষ । ওরা তাইওয়ান থেকে এসেছে । চীন ওদের দখল করে নিতে চায় কিন্তু ওরা বলে যে আমরা তাইওয়ানের লোক ।

চীন আর নর্থ কোরিয়া ছাড়া সব দেশই নাকি কম বেশি ভালো ।

ওদের মতে । ওরা এখানে ফার্ম কিনে নিজেদের কলোনি বানিয়ে থাকে । মাঝে মাঝে রাস্তায় ভেড়ার পাল নিয়ে বার হয় । তখন সব গাড়ি দাঁড়িয়ে

যায় । বনপথে । অরণ্য হলেও, এখান দিয়ে অন্য শহরে ও গ্রামে লোকে যায় ।কাজেই গাড়ি চলেই । বাস বা ট্রেন নেই এদিকে ।

চীনে নাকি রামধনু পাহাড় আছে । সাতরঙা রামধনুর মতন ঐসব পাহাড় । বৃটিশ কলম্বিয়াতেও নাকি এরকম চমৎকার রেনবো পর্বত সারি আছে । নানান খনিজ দ্রব্য ও পাথরের কারণে এই অপরূপ শোভা দেখা যায় ।

ক্যানাডায় আছে সুন্দর , রঙীন Spotted Lake----

এই লেকের জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল -স্ফিতি দেখা যায় যা কিনা বিভিন্ন বর্ণের । সেই টাই অ্যান্ড ডাই কাপড়ের মতন সুন্দর দেখতে ।

আবার ইউরোপের এক শহরে নাকি বিশেষ জাতের পাথর আছে যেগুলি নিজের থেকে আকারে বাড়ে । ভূতাত্ত্বিকেরা অনেক তত্ত্ব দেন এদের গ্রোথ নিয়ে কিন্তু আমার রোমান্টিক মন বলে : থাক না একটুকু প্রাণ ঐ শুষ্ক শিলায় ।

--একটুকু ছোঁয়া লাগে , একটুকু কথা শুনি

তাই দিয়ে মনে মনে , রচি মম ফাল্গুনি !

মন্দ কি ? সবসময় লাল লিটমাস্‌কে নীল করতে হবে কেন ?

হোক্‌ না লাল লিটমাস্‌ সোনালি , কী বলেন ?

শকুনি বললো যে সে নাকি একটি দেশের কথা জানে যেখানে অ্যালঝাইমার্স রুগীদের জন্য তৈরি বিশেষ শহর আছে । এই স্মৃতি হারানো মানুষেরা ঐ শহরে একা একা ঘোরে । শপিং মল আছে যা কিনা শুধু ওদের জন্যই সৃষ্ট । দাম দিতে ভুলে গেলে অথবা হিসেবে ভুল হলে কেউ কিছুই মনে করেন না ।

আবার সুরেখা নামক এক ভারতের গ্রামে মানুষ বুড়ো হয়ে গেলেও যুবকের মতন দেখতে থাকে । যত বয়স বাড়ে ততই যৌবন প্রস্ফুটিত হয় । হয়ত কোনো হরমোনের কারসাজি ।

শকুনিকে আমার কিছু পুরনো বিহরণের গল্প বললাম । একটু জিরিয়ে নেবার জন্য বসেছি একটি কাফেতে । এখানে ভারতীয় খানা মেলে । ছোট্ট কাফে । পাঞ্জাবী বাটার চিকেন, টিক্কা মসালা আর মসালা চায়ে এখানে জাতীয় খানা । দক্ষিণী খানা তত লোকপ্রিয় নয় ।

এখানকার একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ হল ।

ওর গলার আওয়াজ হারিয়ে গেছে । বহুবছর এখানে একা একা থেকে কোনো কথা বলার লোক না পেয়ে ভয়েস বক্সে গোলযোগ দেখা যায় । এখন একপ্রকার মূক । গোঁ গোঁ করে কথা বার হয় ।

আগে নাকি গান গাইতেন । সুমধুর গলা ছিলো । এখন আর কথাই বেরোয় না তো গান ! তবে পুরাতন ক্যাসেটগুলি শোনেন । ভাগ্যিস্ রেকর্ড করা ছিলো । সমস্ত শচীন দেববর্মণের গান । মানুষটি ত্রিপুরি কিনা ! নাম রঞ্জিৎ দেববর্মা । গান ভালোবাসেন বলেই হয়ত এখন সঙ্গত করেন লোকাল গাইয়েদের সাথে ।

আমার ভ্রমণ কাহিনী মেলে ধরলাম ওদের কাছে ।

পাখি সব করে রব অরণ্য -পাহাড়ে

রাতি পোহাইলো ! চোখ মেলে চেয়ে দেখি খুব সুন্দর একটা জায়গায় ভোরের কমলালেবু রং মেখে ভীড় করেছি আমরা , একদল সুদূরের পিয়াসী । জীবন নামক রহস্যময় স্পন্দনের মাঝেই কিছু রঙীন পালক খুঁজে ফেরা । আগের দিন গাঢ় আঁধারে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি । সূর্য পালিয়ে গিয়েছিল । বাইরেটা ভালো করে দেখা হয়নি । পাখির কলতান , মিষ্টি ফুলের গন্ধ আমার সকালটা মাধুর্য্যে ভরিয়ে দিল । ইয়ারকাড , গরীবের উটি বলেই যাকে লোকে চেনে ।

অরণ্য , পাহাড় , কফি বাগান নিয়ে আদিবাসীদের চারণভূমি ।

তামিলনাড়ুর শেভরয় পাহাড়ে এই প্রদেশ । পাহাড়ের ঢালে কফি গাছের সারি । এই এপ্রিল -মে মাসে সাদা জুঁইয়ের মতন ফুলে ছেয়ে থাকে । অপূর্ব তার গন্ধ । মনে হয় কোন মাদকতা ছড়িয়ে যাচ্ছে শিরায় শিরায় ।

প্রত্যুষায় , সূর্যের লাজরক্তিম চুম্বনে কফি ফলের গা বেয়ে চুইয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা স্বচ্ছ বিন্দু । পুষ্পিত পল্লব ---!!

ইয়েরিকাডু শব্দ থেকে এসেছে ইয়ারকাড । তামিল ভাষায় এই শব্দের অর্থ হল জলাশয় ও অরণ্য , ইয়েরি মানে জলাশয় ও কাডু মানে অরণ্য ।

নাহ্ , আমি এখানে কোন ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসিনি । ইয়ারকাডে আমি বেড়াতে যাইনি । গিয়েছিলাম নিঃস্তব্ধতাকে অনুভব করতে । নিরিবিলিতে কিছু সময় কাটাতে । এক অপার শান্তি বিরাজমান এই শেভরয় পাহাড়ের বুকে ।

১৮২০তে এই প্রদেশে প্রথম কফি চাষ হয় । রবার্ট ক্লাইভের এই গ্রীষ্মকালীন আবাস্থলে প্রথম কফি আসে আরব থেকে ।

কিল্লিয়ুর ঝর্ণার পথে হেঁটে যান ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে । ৩০০ মিটার উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে অঝোর ধারায় তরলিত চন্দ্রিকা । নাহ্ সেই জলে চন্দনের গন্ধ হয়ত নেই । কিন্তু যেতে যেতে, পথে অনেক চন্দন গাছ দেখা যাবে । আমার শ্বশুরবাড়িতে অনেক চন্দন গাছ ছিলো । প্রিন্টিং প্রেস , গোবর গ্যাসের প্লান্ট ছিলো ।

সে যাইহোক ইয়ারকাডে সেই চন্দন বনের সঙ্গে যখন কথা হবে তখন কানে কানে সে বলবে - চলে যাও লেডিস সীটে , রাতের আঁধারে তারা ওড়না জড়িয়ে আকাশ তোমাকে ডাকছে না ? সপ্তর্ষিমন্ডল , প্রজাপতিমন্ডল, বীণামন্ডল , রাজহংসমন্ডল আরো কত কি !

আকাশের দিকে চাইলে এই মানবজীবন বড় তুচ্ছ মনে হয় । মনে হয় দুটো ডানা লাগিয়ে উড়ে যাই ঐ গ্রহতারার দেশে । গোধূলী আলোয় দেখা যায় কবেরী নদীর ওপরে সূর্যের আলো লুকোচুরি খেলছে । অপরাহ্নের রক্তিমা মনে এক মায়াজালের সৃষ্টি করে । অনতিদূরে মেট্টুর বাঁধ । অন্যদিকে ইস্পাত নগর সেলাম । আরো কাছে গুটি পোকার চাষ হয় , হয় মসলিনের সুত্রপাত ।

শেভরয় পাহাড়ে আছে শেভরয় মন্দির । এই গুহামন্দিরটি আদিবাসীদের পূজার্চনার জায়গা । প্রতিবৎসর মে-মাসে তাদের বাৎসরিক পূজা হয় এখানে । মন্দিরের ভেতরে একটি সুড়ঙ্গ আছে । পূজারীর মুখে শুনলাম সেই পথে কর্ণাটক অবধি চলে যাওয়া যায় । এখন এই পথ বিষধর সর্পের বাসভূমি ।

একটু দূরে দেখা যায় Bauxite সমৃদ্ধ পাহাড় । খনিজের জন্য যা কেটে কেটে , আকৃতি ছোট করে দেওয়া হচ্ছে ।

দূর পাহাড়ে আছে মুরুগনের মন্দির । আমাদের কার্তিক ঠাকুর হলেন ওদের মুরুগন । তাঁকে লর্ড সুব্রাহ্মনিয়াম বলেও অভিহিত করা হয় । এই দেবতার দুই কনসর্ট । ভাল্লি আর দেবসেনা । ভাল্লি- উপজাতিদের মেয়ে । দ্রাবিড় সুন্দরী । আর দেবসেনা আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রের মেয়ে । তাকে লালন পালন করেছে ইন্দ্রের হস্তী স্বয়ং ঐরাবত ।

এই মন্দিরটি থেকে পাহাড়ের অপরূপ শোভা দেখা যায় । দেখা যায় এই পাহাড়ের প্রাচীনতম বাসিন্দাদের ছোট ছোট কুটির । আড়ম্বর নেই কিন্তু আহ্বান আছে । রৌদ্রস্নাত মধ্যাহ্নে সেই সরল মানুষদের ওপার হতে এক অপার্থিব সুখের হাতছানি আসে । এরাই তো ভাল্লির সন্তান । হিন্দু মাইথোলজিতে সবরকম চেতনার জন্য এক একজন করে দেবদেবী আছেন । এর অর্থ হল যেকোনো ক্ষেত্র ও সমাজ থেকেই একটি হায়ার পাওয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব ।

কুরিঞ্জি ফুলের দেশ এই ইয়ারকাড । এই ফুল ১২বছরে একবার প্রস্ফুটিত হয় । ১০০ রকমের অর্কিড যার ভেতরে ৩০টি বিশেষ প্রজাতির তা নিয়ে সজ্জিত ভারতের তৃতীয় বৃহৎ National

Orchidarium , ২০ বছরের পুরাতন এই সেন্টারের ম্যানেজার আনীজ আহমেদ আনসারির ভাষায় :: Vernonia shevaroyensis is available nowhere else in the world. The lady's slipper orchid paphiopedilum druryi is endangered, but grown here. We also have nepenthes khasiana, a pitcher plant that eats insects."

ARTHUR'S SEAT , VANIAR TEAK FOREST হল অন্যান্য দ্রষ্টব্য । ঐ টিক বনের কাছে বয়ে চলেছে লাস্যময়ী এক জলপ্রপাত ।

বিয়ার গুহা দেখতে হলে শেভরয় মন্দিরের দিকে যেতে হবে । শোনা যায় এই চমৎকার গুহার নিকটে বহু পূর্বে ভল্লুক ছানারা খেলাধূলো করতো । কোন এক রাজার গুপ্ত পথ ছিল এই গুহা। আর আছে প্যাগোডা পয়েন্ট । এখানে আগে পাথরের প্যাগোডা ছিল এখন শুধুই মন্দির । আশেপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায় , দূরে পাহাড়ি গ্রাম । ভেসে আসে বাঁশির সুর । পর্বতাভিযানের সুপ্ত ইচ্ছা থাকলে এই জায়গা আপনাকে আকর্ষণ করবেই ।

পৃথিবী জুড়ে এখন যা হচ্ছে ইয়ারকাডও তার বাইরে নয় । গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, পশুপাখিদের তাড়িয়ে মানুষ বাসা বাঁধছে । এখানে বহু মানুষ আগে শিকার করতে আসতেন । পথে চলতে চলতে চকিতে কোন বনহরিণী রাস্তা পেরিয়ে যেত । কিন্তু এখন বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়ায় দুষ্কর ।

তবুও নানান পাখি , শৃগাল , বাইসন , অহিনকুল , খরগোশ এসবের দেখা মেলে । কপাল ভালো থাকলে হরিণের দেখাও পাওয়া যায় । যেন নিজেদের লুপ্ত বাসভূমির স্মৃতি হাতড়েই তাদের এখানে ফিরে ফিরে আসা ।

কফি এস্টেটগুলি নানান ফলের চাষও করে । কমলালেবু , পেয়ারা , কাঁঠাল , আঙুর , পেঁপে ইত্যাদি । এচাড়াও এলাচ , গোলমরিচ প্রভৃতি দেখা যায় ।

চন্দন , ইউক্যালিপ্টাস , সিলভার ওক গাছের ছায়ামাখা পথ ধরে বাজারে চলুন । নানান ভেষজ তৈল মিলবে । ইউক্যালিপটাস তেল , উইন্টারগ্রীন তেল , চন্দন তেল বিভিন্ন ব্যাথা কমাতে বা শরীরকে ঝরঝরে রাখতে অদ্বিতীয় ।

ইয়ারকাড লেকের পাড়ে নানান ভাজা সহযোগে অপূর্ব চা পান করে কিছুক্ষণ বসে চলে আসি নিজ নীড়ে । হ্যালাপিনো ভাজাও আছে ।

আমরা যেই রিসর্টে ছিলাম তারই ছোট ছোট কটেজের সামনে বেতের চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিতাম সারাটা দিন । বিকেলের মরা আলোয় ঝরে পড়তো নানান ফুল । নিঃস্তব্ধতা মুখর হত ঝরা ফুলের শব্দে । অপূর্ব সুবাসে ভরে যেত চারিপাশ ।

ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে যেতাম আমরা ।

আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্বর্ণালী সন্ধ্যায় কোন রূপসী কবির ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ হয় এক মধুছন্দা । সেই মধু মেখে সুন্দরী ইয়ারকাড হয়ে ওঠে অপরূপা , অনন্যা ।

দূরে অরণ্যের আভাস । ভেসে আসে আদিবাসী সুরের মূর্চ্ছনা । বর্ণনাতীত এই সুরধ্বনি একান্তই অনুভূতির । যেমন বর্ণনা করা যায়না আমার কিছুদিন এই পাহাড়ে থাকার অভিজ্ঞতা । তা শুধুই উপলব্ধি করার । আত্মমগ্ন হয়ে নিজের অন্তরে হারিয়ে যাবার ।

ইয়ারকাড আজও ডোবায় । মাতায় । ভরায় । গরীবের উটি হলেও ।

গরীবরাই মানুষ , নয় কি ? বরং আমরাই ফানুস !

আল্পস এর ইন্সটাগ্রামিং-

জীবনের প্রথম লেখা । লেখায় ফটোশপিং করিনি , অরিজিন্যালই আছে ....☺

এক শীতল ভোরে Mumbai হয়ে পৌছলাম Zurich শহরে।বিমানবন্দরে পৌছে দেখলাম বেশ ঠান্ডা- কাঁপতে কাঁপতে লাগোয়া ট্রেন স্টেশানে গিয়ে এক কাপ ধুমায়িত কফি হাতে বেশ গুছিয়ে বসলাম। এখান থেকে ট্রেন ধরে যেতে হবে Interlaken বলে একটি জায়গায়। তা বেশ দূর। ঘন্টাখানেক তো বটেই। চোখের সামনে দিয়ে অনেক ট্রেন চলে গেল। বেশ কিছু পরে আমাদের ট্রেন এল। তাতে চড়ে বসলাম।প্রকৃতির কোল ঘেঁষে চললাম interlaken এর পথে। Interlaken জায়গাটির এরকম নাম- কারণ দুটি লেক এসে এখানে মিলিত হয়েছে। সেই মিলনক্ষেত্রর নাম Interlaken- a place between lakes Thun and Brienz .

আমার প্রিয় Continental খানা খেতে খেতে চললাম গন্তব্যস্থলের দিকে। এক আশি বছরের মানুষের সাথে আলাপ হল। উনি তো অবাক ! মাত্র এই কদিনে কি করে দেখবে এই দেশ ?আমরা বললাম যে এটা ঝটিকা সফর - পরে সময় করে এসে বাকিটা দেখা হবে । বাইরে অসাধারণ দৃশ্য ! কথা বাড়াতে ইচ্ছা করছিল না। সময়মত পৌছে গেলাম Interlaken শহরে। আল্পস ঘেরা শহর।পাহাড়ের মাথায়

তুষারের টুপি। নয়নাভিরাম। মৃদু মৃদু বৃষ্টি পড়ছে। বেশ ঠান্ডা। হোটেল খুঁজে হাজির হলাম। সেটি Best western chain of hotels এর একটি। সুন্দর ব্যবস্থা ।

তন্বী, কুঁচবরণ,পক্কবিম্বষ্ঠী এক তনয়া আমাদের নিয়ে গেল ঘরে। মনে মনে বললাম ' এই দেশের সব সুন্দর'- দেহ টেনে নিয়ে চললো বিছানার দিকে। ক্লান্ত,রাতজাগা আমি একটু বিশ্রাম চাই।পরের দিন ভোরে যাবো " ইয়ানফ্রজো'-যাকে বলা হয় Top of Europe"-

যথারীতি পরের দিন সকালবেলা চললাম ইয়ানফ্রজো এর পথে। বেশ কয়েকবার ট্রেন বদলে যেতে হয় সেখানে। প্রথমে সবুজ বনরেখা তারপর তুষার ঢাকা পর্বতশ্রেনী। এই ভাবে যেতে যেতে এক সময় সুড়ঙ্গ এর ভেতর পৌছে যাওয়া যায়। চারিপাশে শুধু দেওয়াল। কিন্তু ভেতরে সব দেখা যায়। একটি Monitor আছে তাতে। কতটা পথ গেলাম , কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি এইসব। এই না হলে বিদেশ ? দুর্গমতাকে কি করে জয় করতে হয়, কি করে সেখানে ফুলের চাদর বিছিয়ে দিতে হয় তা মনে হয় বিদেশে না গেলে মালুম হয় না।নিকষ কালো সুড়ঙ্গ ভেদ করে চললাম Top of europe-আমার ঐ ঠান্ডাতে অবস্থা খারাপ।

আমার শারীরিক কষ্ট দেখে এক রেলকর্মী আমাকে কিছু SOS ওষুধ দিলেন।

সুড়ঙ্গ থেকে বেড়নোর পর চারিদিকে শুধু ধু-ধু বরফ চোখে পড়ে। এইভাবে চলতে চলতে পৌছালাম ১১০০০ফুট উঁচ্চতার Jungfraujoch (ইয়ানফ্রজো)তে। এটি Sking এর জন্য বিখ্যাত। British রা এই স্থানকে তাদের শীতকালীন ছুটি কাটাবার জায়গা হিসাবে বেছে নিয়ে ছিল।ওখানে আছে একটি বরফ এর প্রাসাদ। আর আছে একটি মিউজিয়াম। সবথেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য হল এই যে সেখানে

একটি ভারতীয় রেস্তরাঁ আছে। নাম তার Bollywood ; আমরা সেখানে কব্জি ডুবিয়ে ভারতীয় খাবার খেলাম, শুধু চিকেন এর বদলে টার্কি-র ঝোল।

বরফের প্রাসাদ দেখতে গিয়ে বেশ কয়েকবার পা পিছ্লে আলুর দম। কারণ উপযুক্ত জুতো-র অভাব। বরফ নিয়ে লোফালুফি করা হল বেশ কিছুক্ষণ। চারিপাশের শুভ্র সৌন্দর্য উপভোগ করে সময়মতো ফিরে এলাম interlaken.

পরেরদিন যাব lucern শহরে। Interlaken শহরটি ছোট। চারিদিকে ফুলের চাদর বিছানো। টিউলিপ-টা চেনা, অন্যগুলো অচেনা। হরেকরকম্বা ফুলের সমারোহ। সন্ধ্যায় গেলাম একটি স্থানীয় ফাস্ট-ফুড সেন্টারে, McDonald's. কিছু স্থানীয় মানুষজনের সাথে আলাপ হল। জানা গেল এই দেশের সিংহভাগ লোক সুইস্। আর আছে কিছু ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান। প্রধান ভাষা সুইস্। ইংরিজি জানা লোকের সংখ্যা খুব কম। স্থানীয় মানুষ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজি বলতে পারে। প্রধান খাদ্য মাংস (গো, শুকর, মুর্গি, ভেড়া), চিজ, অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য, ডিম, ফলমূল, স্যালাড ও নানান্ ধরণের পাউরুটি। প্রধান ধর্ম খ্রিষ্টধর্ম। এছাড়াও আছে ইহুদি, ইসলাম ও অল্প সংখ্যক (0.5%) হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

পরেরদিন ঊষালগ্নে পাড়ি জমালাম Brienz লেকের মধ্য দিয়ে বিলাসবহুল নৌকা (Cruise) করে lucern এর পথে। লেকের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, চোখে পড়ল পাহাড়ের উপর থেকে লেকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঝর্ণা। যেন ‘তিরতিরিয়ে বইছে ঝোরা খুশীতে মাতাল।

আমরা জানলার ধারে বসে জমিয়ে কফি ও চিকেন রোস্ট খেতে খেতে

সুন্দরী ঝর্ণার, লেক প্রেমিকের বুকে মিশে যাওয়া দেখছিলাম। এইভাবে চলতে চলতে পৌছনো গেল ব্রিনজারসী (Brienzersee)শহরে।

নামগুলো অসম্ভব খটমট । সেখান থেকে বেশ পুরোনো অনেকটা সেই Sherlock Holmes এর গল্পের মত নস্টালজিক একটি রেল পথ ধরে ট্রেনে করে গেলাম লুজার্ন শহরে। স্টেশানে নেমে ভীড় ঠেলে গেলাম Tourist Information Centre এ। সেখান থেকে খোঁজ খবর নিয়ে হোটেলে। সুন্দর ব্যবস্থা। নীলনয়না, স্বর্ণকেশীর উষ্ণ অভ্যর্থনা। মনে হচ্ছিল সেই গান ----*এই দিন যেন প্রতিদিন ফিরে আসে বারেবার, এই ক্ষণ যেন চিরকাল ছুঁয়ে থাকে মনটা আমার।*

এবারের গন্তব্যস্থল মাউন্ট টিট্‌লিস্‌।

হিমশীতল সকাল, কুয়াশার চাদর জড়ানো। সাথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। আমরা চললাম টিট্‌লিস্‌ এর পথে। Tourist Information Centre থেকে বহু মানুষ ফিরে গেলেন খারাপ আবহাওয়ার জন্য, যার ভেতর বেশ কিছু ভারতীয় ছিলেন। Engelberg থেকে কেবল কার এ করে যেতে হয় মাউন্ট টিট্‌লিস্‌। আমরা প্রথমে ট্রেনে করে গেলাম engelberg । সেখান থেকে বেশ কয়েকদফা কেবল কার বদল করে (একটি কেবল কার এর নাম ROTAIR - কারণ সেটি rotate করে যাতে সকলে চারিপাশ বেশ ভালো করে দেখতে পায়) অবশেষে টিট্‌লিস্‌ পাহাড়ে পৌছনো গেল। Temperature মাইনাস এর ঘরে। যাত্রাপথ ভয়ংকর সুন্দর। কারণ কেবল কার করে প্রাণ হাতে নিয়ে সু-উচ্চ টিট্‌লিস্‌ পর্বতে ওঠা একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতা বাকি অংশটুকু ভীষণ সুন্দর। শ্যামল বনভূমি পেরিয়ে বরফ ঢাকা উপত্যকা ছাড়িয়ে সুন্দর টিট্‌লিস্‌ চূড়ায় তখন আমরা কজন। অসাধারণ দৃশ্য চারিদিকে। একটি ভিডিও শো দেখলাম। বরফহীন টিট্‌লিস্‌ এর রূপ। বেশ ভালো লাগলো। রেস্তোরাঁতে কচি বাছুর (veal) ও সব্‌জি সেদ্ধ

সহকারে ভোজনপর্ব সম্পন্ন হল। কিছু কেনাকাটা করলাম। দাম যদিও আকাশ ছোঁয়া। Switzerland এর মুদ্রা হল swiss franc, এক সুইস্ ফ্রাঁ হল প্রায় ৩৪ ভারতীয় টাকার সমান এইমুহূর্তে । (আন্তর্জালে দেখলাম ২০১৬ তে ওটা ৬৮টাকা ৬০পয়সা হয়েছে ।)

গোধূলিলগ্নে ফিরে এলাম লুজার্ন শহরে। আবহাওয়া পালটে গেছে। পরিষ্কার আকাশ, মৃদুমন্দ সমীরণ - অর্থাৎ মন ভালো করা পরিবেশ। এক পেয়ালা ধূমায়িত কফি ও মুর্গিভাজা খেয়ে সেদিন এর মত নিদ্রা গেলাম। পরের দিন লুজার্ন শহর ঘুরে দেখলাম। T-shirt, কাঁচের পুতুল, প্রচুর চকোলেট ও বিখ্যাত সুইস্ ঘড়ি কিনে শপিং পর্বের ইতি টানলাম।

শেষ গন্তব্যস্থল মাউন্ট পিলাটাসে (পিলাটুস, ওদের ভাষায়) যাবার আয়োজন করতে হবে। পিলাটাস পাহাড়ের ছায়ায় ঢাকা লুজার্ন শহর ।আমরা বাস-এ করে একটি জায়গায় গেলাম। সেখান থেকে পিলাটাস যাবার কেবল কার ধরতে হবে।

এই দুনিয়ার সব থেকে খাড়া পথ ধরে Cogwheel Train এ করে চারিপাশের পাহাড়ের অপূর্ব মোহময় রূপ দেখতে দেখতে ও সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যে সময় যাই তখন রাস্তা বন্ধ ছিল । তুষারপাত হওয়াতে। তাই অন্য পথ হয়ে, খোদ শহরের ওপর দিয়ে সোজা পাহাড় ও মালভূমি ডিঙ্গিয়ে পিলাটাস এর মাথায় পৌছে গেলাম। পিলাটাস পাহাড় অভূতপূর্ব। এর সৌন্দর্য্য ভাষায় বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। হালকা বাদামি ও গাঢ় খয়েরি মিশিয়ে পাথুরে পাহাড়। সবুজ প্রায় নেই। কোন কোন জায়গায় শ্বেতশুভ্র বরফ এর আস্তরণ। পাহাড়ের গায়ে পাথরগুলো দেখলে মনে হবে যেন কোন গ্রীক্ বা রোমান ভাস্কর তার সৃষ্টিশীলতা উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসল ভাস্কর হল প্রকৃতি। ঝিরিঝিরি তুষারপাত হচ্ছিল। সাদা বরফে ঢাকা পিলাটাস

পাহাড়ে এক ঝাঁক কালো কুঁচকুচে পাহাড়ি বোধকরি ময়নাই হবে ; অদ্ভুত একটা contrast এনেছিল যা না দেখলে উপলব্ধি করা মুশকিল। পাখিগুলো উড়ে এসে tourist দের হাতে, মাথায় বসছিল। শুধু একটু দানা-পানি দিলেই হল। মজা লাগছিল দেখে। প্রচুর ছবি তুল্লাম যদিও জানি এই দুনিয়ার কোন ক্যামেরাই পারবে না এই ভূ-স্বর্গের রূপ কে ফিল্মবন্দী করতে। লুজার্ন শহরে ফিরে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। এত সুন্দর একটা দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে! কিন্তু অল্প দিনের টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। নিয়মের বেড়াজালে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন আবদ্ধ।

হোটেলের ঘর থেকে শুনতে পেলাম নিকটবর্তী গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি। যেন কান পেতে শুনলে শোনা যাবে সে বলছে এবার তোমার ঘরে ফেরার পালা কন্যে ! তাই পরদিন ঊষসী ঊষায় সব মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে, রূপসী সুইজারল্যান্ডকে সজল চোখে বিদায় জানিয়ে প্লেনে চেপে বসলাম মুম্বাই শহরের উদ্দেশ্যে। ফিরতে হবে আবার নীড়-এর ঊষ্ণতায়।

(পাঠক , জানেন বাড়িতে থাকা অসম্ভব বোরিং একটি ব্যাপার আমার কাছে ! আমি পেটুক প্লাস পর্যটক ☺)

ফেরার পর ফটোগুলো দেখে মনে হত কী সুন্দর ! কিন্তু অন্তরে বাজতো বিষাদ বেণু । যা দেখে এসেছি, বিটস্ অ্যান্ড বাইটসে তার প্রায় কিছুই ধরা পড়েনি ।

অন্য অরুণাচল

কাল অরুণাচল ঘুরে এলে কেমন হয় ?

পতিদেবের এই কথা শুনে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ !ব্যাঙ্গালোর থেকে সুদূর অরুণাচল তাও পরেরদিন ....এও কি সম্ভব ?আজকাল তাহলে ইথার তরঙ্গ চেপে দেশ ভ্রমণ ও করা যাচ্ছে ! কিন্তু এই অরুণাচল পূর্ব ভারতের রাজ্য নয় , এই অরুণাচল তামিলনাড়ু রাজ্যে থিরুভান্নামালাই নামে এক ছোট্ট শহরে । এটি একটি পবিত্র পাহাড় , দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে এর গুরুত্ত্ব অপরিসীম । একে শিবলিঙ্গের প্রতিমূর্তি বলে ধরা হয় । এর পাদদেশে আছে ভগবান শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রম । থিরু মানে শ্রী , আন্না মানে বড় (জেষ্ঠ্য) মালাই মানে পাহাড় -এই হল থিরুভান্নামালাই নামের ইতিবৃত্তি । আদতে এই পাহাড় হল কলম অফ্ লাইট । জ্ঞান অগ্নি ।

শরতের আকাশের মন বোঝা দায় । কখনো মেঘ কখনো রৌদ্র ....সেই রৌদ্রছায়া দেখতে দেখতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি গায়ে মেখে চললাম অরুণাচলের খোঁজে । ব্যাঙ্গালোরের থেকে পথ ভারি সুন্দর । চ'ওড়া রাস্তা , মাখনের মতন মসৃণ ।দুপাশে পাথুরে পাহাড় , কখনো কখনো সবুজের হালকা ছোঁয়া দেখে মনে হবে প্রকৃতির এ কোন খামখেয়ালিপনা । পাহাড়ের গায়ে অতি বিপজ্জনক ভাবে পাথর ঝুলে আছে । মনে হয় 'এই বুঝি ঘাড়ে পড়লো' !এইভাবেই চলতে চলতে আসবে কৃষ্ণগিরি । সার্থক নামখানা ---চারিদিকে কৃষ্ণপাহাড়ের সারি , নিরাভরন - অনাদৃত ।

কৃষ্ণগিরি থেকে পথ বেঁকে গেছে অরুণাচলের দিকে । দুপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ । কোথাও কোথাও জঙ্গলের আকার নিয়েছে ।

এরকম আড়ম্বরহীন শান্ত বনাঞ্চল খুব কম আছে । পথে পড়বে বেশ কিছু সরোবর - খোলামেলা প্রকৃতির বুকে দীর্ঘ জলাশয়গুলো অতিরিক্ত আকর্ষণ । দেখতে দেখতে চলে আসে থিরুভান্নামালাই । অরুণাচলের চূড়া দেখা যায় । মেটে পাথর আর গাঢ় সবুজে ঢাকা ....

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল

রমণাশ্রমম্ শোভিতম

কাকচক্ষু সরোবর বেহত নির্মল

শ্রী অরুণাচল শিবম্ ।

পৌঁছে যাই রমণাশ্রমম্ এ । পাথরের ছোটছোট ঘর , খড়ের ছাউনি , গাছগাছালি এই নিয়েই আশ্রম । যেন প্রাচীন কোন ঋষির চারণভূমি !আশ্রম চত্বরে ময়ূরময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে । গগনে ঘোর ঘনঘটা দেখা দিলে ওরা পেখম মেলে , কেকা শোনা যায় ।

আশ্রমে দুটি উপাসনাস্থল আছে । একটি মাত্রুভূতেশ্বরা মন্দির (রমণ মহর্ষির মায়ের মন্দির , মা মোক্ষলাভ করেন) অন্যটি রমণ মহর্ষির সমাধিস্থল ।এছাড়াও কষ্টিপাথরের বেশ কিছু ইষ্টদেবতার মূর্তি আছে ।এদের বেশির ভাগ’ই আমার অচেনা । মাত্রুভূতেশ্বরা মন্দিরটি পাথরের ।অপরূপ তার কারুকার্য । শান্ত, শীতল পরিবেশটি মনে ভক্তি জাগায় । এছাড়াও একটি মেডিটেশন হল আছে । সেখানে পৃথিবীর নানান প্রান্তের মানুষ ধ্যান মগ্ন । আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল জন , রাহুল , হিতাচি , মার্গারেট , ইয়ু -লী এবং সান্তানারা ।

আশ্রমে থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের । সব দক্ষিণ ভারতীয় খাবার । ভাত , সম্বর , রসম , সবজি , পায়েসম্ ইত্যাদি । সাহেব, অ্যাফ্রিকান ও চীনা-জাপানিরাও মাটিতে বসে সকলের সঙ্গে হাত দিয়ে ভাত মেখে দিব্যি খাচ্ছে ।সবকিছুই বিনাপয়সায় । ছোটছোট গেস্টহাউস আছে , অ্যাট্যাচড্ বাথ -চাইলে গরম জল ও মেলে । নিখরচায় সব কিছুই শুধু বুকিংটা আগে থেকে করে আসতে হয় ।

এই আশ্রমে আমরা এসেছি ‘ ইনার কোয়েস্ট ’ এর জন্য ।

আমার সবচেয়ে ভালোলাগে এখানে কোন গুরু-চেলা ব্যাপার নেই , নেই টাকা চাইবার দৃষ্টিকটূ ব্যবস্থা ! আছে কেবল ভগবান রমণ মহর্ষির উপদেশাবলী ও পরম শান্তি । রমণ মহর্ষি এই অরুণাচলের আহ্বানে মাত্র ১৬/১৮ বছর বয়সে সুদূর মাদুরাই থেকে একবস্ত্রে চলে আসেন । প্রথমে থিরুভান্নামালাই মন্দিরে ছিলেন । তারপর অরুণাচলের স্কন্দাশ্রম ও বিরূপাক্ষ গুহায় টানা পঁচিশ-ত্রিশ বছর ছিলেন । কৌপিন পরিহিত এই মৌন সাধুকে পরবর্তীকালে পাহাড়ের নীচে নামতে বাধ্য করে ধর্মপরায়ণ গ্রামবাসীরা - সেই থেকেই রমণাশ্রমম্ এর সৃষ্টি ।

এই পাহাড়ের চূড়ায় পায়ে হেঁটে ওঠা অতি পবিত্র কাজ বলে মনে করা হয় ।এছাড়া অরুণাচল খালি পায়ে প্রদক্ষিণ করলে অশেষ পূণ্য হয় বলে বিশ্বাস । এই প্রদক্ষিণ পথ মোট ১৬ কিমি । আমি মাত্র ৭ কিমি করতে পেরেছি । দক্ষিণের বহু নামীদামি মানুষ পরম ভক্তিভরে খালি পায়ে প্রদক্ষিণা করেন যার ভেতর আছেন সাম্প্রতিককালের খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক ‘ ইলিয়া রাজা ’ -উনি এই পাহাড়কে নিয়ে একটি কমপ্যাক্ট ডিস্ক প্রকাশ করতে চলেছেন যার অর্কেস্ট্রা ও সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্র্যামি বিজয়ী শিল্পীরা রয়েছেন ।

আমি ওঁকে ডাকলামঃ হাই ইলু !

সঙ্গী বলে : এতবড় একজন মিউজিক জিনিয়াসকে তুমি নাম ধরে ডাকছো ? তাও ইলু বলে ?

হেসে বলি : জিনিয়াস উনি আশ্রমের বাইরে । অন্দরে, ইগো বিসর্জন দিয়ে থাকতে হবে । নাহলে বৃথা এই পুণ্যভূমে পদচারণা ।

উনি অবশ্যই অসম্ভব ভালোমানুষ আর মাটিরও ।

আমি বিরূপাক্ষ গুহা অবধি যেতে পেরেছি আর ওপরে ওঠা সাধ্যে কুলালো না । অনেক ঝর্ণা দেখেছি । মহর্ষি যখন ওখানে ছিলেন তখন একটি ঝর্ণা নাকি নিজে থেকে ওখানে তৈরি হয়ে যায় ওঁর গুহার কাছে !

শীতল বাতাস আর লেমনগ্রাসের সুবাসে মনপ্রাণ স্নিগ্ধ হয় । এই পাহাড় ভেষজ ঔষধির এক বিশাল ভান্ডার । আর লেমনগ্রাস দিয়ে জল ফুটিয়ে চা বানান স্থানীয় মানুষজন । তার স্বাদ চমৎকার । পাহাড়ে চড়ার সময় দেখলাম গরীব গুর্বোরা মাথায় করে চারাগাছ নিয়ে ওপরে উঠছে । বুঝলাম অরণ্যায়ন হচ্ছে । এত গাছ থাকা সত্ত্বেও আরো গাছের কি প্রয়োজন হতে পারে সেটা ঠিক বোধগম্য হলনা । এ যেন 'খোদার ওপর খোদগারী '-

মহর্ষির আশ্রম, মানুষের সাথে পশুপাখিদেরও ঠাঁই দিয়েছে । এখানে অনেক পশুর সমাধি আছে । উনি বলেছেন যে খুব রেয়ার কেসে পশু পাখিদেরও মোক্ষ হতে পারে । একটি সাদা ময়ূর ছিলো । সে নাকি আগের জন্মে মহর্ষির সহচর ছিলো । আর লক্ষ্মী দা কাউয়ের সমাধি তো জগৎ

বিখ্যাত। লক্ষ্মীর মোক্ষ হয়ে যায়। সেও আগের জন্মে মহর্ষিকে নিয়মিত খাবার দিতো যখন উনি পাহাড়ে মৌন হয়ে ছিলেন।

পাহাড় থেকে দেখা যায় থিরুভান্নামালাই জনপদ।থিরুভান্নামালাই মন্দিরের অপূর্ব চূড়াটিতে অস্তরাগের আলো পড়ে খুব মায়াময় লাগছে। পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্য মনকে শিহরিত করে তোলে। নিচের আশ্রম থেকে ভেসে আসে স্তোত্রপাঠ :

ওম্ নমহ্ -ভগবতে , শ্রীরমণায়ো !

ধীর পায়ে আমরা নেমে আসি আশ্রম চত্বরে। এই আশ্রমেই একদিন পদধূলি পড়েছিল সোমারসেট মম্ , পল ব্রানটান , Henri Cartier-Bresson ,গান্ধিজী , পরমহংস যোগানন্দ, আনন্দময়ী মা, স্বামী প্রণবানন্দ, কার্ল জং প্রভৃতির। আবার ইদানিং এক ভন্ডের আবির্ভাব হয়েছে যে নিজের মোক্ষ হয়ে গেছে বলে দাবি করছে। মহর্ষির ডাইরেক্ট শিষ্য নাকি লোকটি। গুন্টুর থেকে এসেছে। এক মহিলাকে নিয়ে একটি কেল্লায় অবস্থান করছে। সমস্ত গডদের মূর্তি কেল্লার বাইরে বার করে দিয়েছে। মোক্ষ হয়ে গেছে না ! যথারীতি ভারতের মতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে এই ভন্ডের ভক্তও জুটে গেছে অনেক। আজকাল চোরটা ব্যাটা , নেটে দীক্ষা দেয়। ডোনেশান ---ডলারে , পাউন্ডে, লিরাতে।

আরেক সাহেব এসে জাঁকিয়ে বসেছে। মহর্ষি কাকে দীক্ষা দেবেন, কাকে দেবেন না সমস্ত কন্ট্রোল করা শুরু করেছে। লোকটিকে আমি ইমেলে কড়া ঝাড় দিয়ে দিয়েছিলাম।

এদের বলা উচিৎ যে ---মহর্ষি ইজ নট ইওর প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ অ্যাজ ইওর পিওর কনশাসনেস।

এই সাহেবের এক ওয়েবসাইট আছে । সেখানে মানুষ কমেন্ট পোস্ট করে রেখেছে মক্- করে : সো হাউ অ্যাবাউট বলিউড , শেয়ার ইন্ডেক্স , ফেমিনিজ্ম্ ?

ঘোরকলি বুঝি একেই বলে । মহর্ষি বলে গেছেন : যতদিন এই আশ্রমের প্রয়োজন আছে ততদিন থাকবে তারপর উঠে যাবে ।

উঠে যাবে মানে ফিজিক্যালি নয় , স্পিরিচুয়ালি ।

যদিও আশ্রম চালান মহর্ষির পরিবারের মানুষ এবং তা খুব সুষ্ঠুভাবেই চলে । ঐ ভন্ড সাধু কয়েকবার আশ্রমের দখল নিতে আসে । কিন্তু আইনের কারণে সম্ভব হয়নি । এর এমনই মোক্ষ হয়ে গেছে যে দুনিয়ার কিছুই এর কন্ট্রোলে নেই । আশ্রমের দখল নিতে আসে আর অপমানিত হয় । মহর্ষি যখন স্কন্দাশ্রমে ছিলেন তখন এক সাধু সবসময় স্কন্দাশ্রমের সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করতে চাইতো । শেষে উনি বলেন : তোমার সবসময় আই-আই , ইগোর প্রকাশ । আমরা এর ঠিক উল্টো । কাজেই তুমি এই আশ্রম সামলাও , আমি নিচে চলে যাচ্ছি ।

উনি নিচে নেমে আসেন । সেখানেই বর্তমান আশ্রম গড়ে ওঠে ।

মেডিটেশন হলে বসে সমস্ত চিন্তাগুলিকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি । চেষ্টা করি আত্ম-উপলব্ধির প্রথম পাঠ নেবার-- নিজেকে চেনার , আত্মাকে খোঁজার । নিজ কনশাসনেসে ডুব দেবার ।

রাতে গরমভাত আর খাঁটি ঘিয়ের সুগন্ধে আহারে বসি ।

যদিও অসম্ভব টক্ খাবার খেতে কিঞ্চিৎ সমস্যা হয় আমার ।

পাশে একটি বাচ্চা বসে সমানে রসম্ নিচ্ছে আর খাচ্ছে । আমি খুবই অবাক হই এইটুকু শিশুর এই রেটে টক্ খাওয়া দেখে !

অপেক্ষা করে থাকি -খাওয়া শেষে বাইরে গিয়ে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার । অন্য হোটেলে চুটিয়ে বিরিয়ানি খাই পরে ।

খাওয়া শেষে সুখনিদ্রায় ঢলে পড়ি । পরেদিন ঊষালগ্নে ফেরার পালা - এবার অরুণাচলের সবুজ বনানী থেকে কংক্রীটের জঙ্গলে ।

এবং বোরিং লাইফ !

অরুণাচলকে বলা হয় গুপ্ত তীর্থ । ভান্ডারে অনেক পুণ্য না থাকলে এখানে আসা যায়না । এলেও, কর্মা স্ট্রেট হয় বলে জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয় । এরকম অনেক মানুষ আছেন যাদের এখানে আসার পরে মস্তিস্কের গোলযোগ দেখা দিয়েছে । তবুও মানুষ আসে । অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ।

যুগযুগান্ত ধরে । অমল মনে , নির্মল প্রয়াসে ।

আতি কেয়া খান্ডালা ! (ছদ্মনামে লেখা হয়েছিলো আগে)

২০০৫ এর এক দিনে গেলাম পুণে , গিয়েছিলাম ব্যাক্তিগত কাজের জন্য । সেখানে কিছুটা সময় অতিবাহিত করার পরে হঠাৎই মনে হল কাছেই তো খান্ডালা - লোনাভালা । একবার ঘুরে আসিনা কেন ! সিনেমায় তো দেখেছি অনেকবার । এই শৈলশহর অসাধারণ , শুনেছি । তারপর একটি গাড়ি বুক করে এক সুন্দর সকালে রওনা হলাম খান্ডালা অভিমুখে । খুব সুন্দর রাস্তা । চওড়া হাইওয়ে, সুন্দর সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ । বাতাসের গতিতে আমরা উড়ে চলেছি খান্ডালার দিকে । সহযাত্রীরা দেখলাম বেশিরভাগই নন বেঙ্গলী । সবাই চলেছি একই পথে- ওরা চলেছে মুম্বাই অভিমুখে , আমি লোনাভালার দিকে ।

অনেকটা যাবার পরে একটি বিশাল ধাবায় আমরা নামলাম । সার দিয়ে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । আজকাল ধাবাগুলোতে তো আধুনিকতার ছাপ থাকে । সেই ওল্ড কনসেপ্টের মতন খাটিয়া , বিড়ি, লরি এইসব দেখা যায়না বরং কফিমেশিন , ঝকঝকে টেবিল চেয়ার এইসব থাকে ।

আমরা একটা কোণা দেখে আয়েস করে বসলাম ।

বসে পাউ ভাজি আর কফি-টফি খেলাম । তারপর আবার রওনা । বেরিয়ে যত এগোচ্ছি তত ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়ছে , শিল্পীর আঁকা ছবির মতন । অনেক রাস্তায় লং ড্রাইভ করেছি কিন্তু এটাই আমার দেখা বেস্ট রাস্তা ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শুধু নয় , রাস্তার গঠন , মসৃণতা মনে করিয়ে দেয় বিদেশের কথা । চওড়া পথ , লরি আর হরেক রকমের গাড়ি চলেছে । কিছুদূর গিয়েই এলো সুন্দরী লোনাভালা । ছোট্ট শহর ।

কিছু হোটেল, রেস্তোরাঁ ও কিছু দোকানপাট নিয়ে শহরটা ।

শুনেছি মুম্বাইয়ের ধনীরা ওখানে প্রপার্টি কিনে রাখেন । কিছু ছবির মতন বাড়িও চোখে পড়লো । সেগুলোকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম খান্ডালার দিকে । যেতে যেতে হঠাৎ দুপাশের দোকানে চোখ গেলো । ভালো করে দেখে বুঝলাম ওগুলো চিক্কি , ভারতের বিখ্যাত চিক্কি ওখানেই তৈরি হয় । অনেকটা আমাদের বাদাম চাকির মতন দেখতে ।

ক্রমশ খান্ডালা স্পষ্টতর হচ্ছে । কতগুলো ছোট ছোট শৈল শ্রেণী নিয়ে এই শহর । একটা সুন্দর জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ছোট্ট খাবারের দোকানে বসে চতুর্দিকের পাহাড় দেখলাম । অপূর্ব তার চেহারা । পাহাড়ের গা-গুলো বাদামি ও কালো মিলিয়ে খাঁজ কাটা কাটা , হালকা সবুজের আভাস কোথাও কোথাও । ঐ সুন্দর পরিবেশে বসে মনখুলে বাঙালী আড্ডায় মাতলাম ।

দুপুরে বেরিয়ে আবার চলার শুরু । মাঝে সুন্দর একটা রেস্তোরাঁতে বসে লাঞ্চ সারলাম । পনীর দিলরুবা , চিকেন ভিন্দালু , গোয়ান ফিস কারি আর শ্রীখন্ড - দারুণ ভোজন হল ।

আবার রাস্তায় বেরিয়ে পাহাড়ের শোভা দেখতে লাগলাম। সঙ্গে কিছু মনোমুগ্ধকর পাহাড়ি বাংলো। সবুজের ছোঁয়ায় মনে হয় ইকো -বাড়ি। এক একটা পাহাড়ের রূপ এক এক ধরণের। শুনছি বৃষ্টিমাসে এইসব পাহাড়ের গায়ে একটা সতেজ সবুজ আভা আসে। আর অনবরত তিরতিরে ঝর্ণায়, সবুজের সঙ্গে দুধ সাদা জলরাশি মিলিয়ে অদ্ভুত এক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। শহুরে মানুষ আমরা, বড় টানে এই আদিম রূপ। যদিও বর্ষায় এখানে প্রচন্ড বৃষ্টি- লোকে তত আসেন না। এই সহ্যাদ্রি পর্বতমালাতে লোকে ট্রেকিং করে থাকে। হারিয়ে ফেলে নিজেকে কোন এক নির্ঝরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

ডিউকস্ রিট্রিট নামক একটি সুন্দর হোটেল আছে, সেখান থেকে সহ্যাদ্রি পাহাড়ের রূপ আর উপত্যকার সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে।

ফেরার সময় চিক্কি কিনলাম। এত সুস্বাদু চিককি জীবনে খাইনি। অনেক কেনা হল। গুড় দিয়ে তৈরি বাদামের চাকি, অনেকটা তিলতক্তির মতন। কোনটা পেস্তা বাদামের, কোনটা আখরোটের, কোনটা কাজুর চিক্কি। যত রকমের ড্রাই ফ্রুটস্ হয় সব কিছুরই চিক্কি দেখা গেলো। সুন্দর একটা সুবাসে ভরা সেইসব চিক্কি।

সুবাসিত চিক্কি নিয়ে, কিছু পেট পুরে খেয়ে আবার ফিরে এলাম দূর্গ নগর পুণেতে। সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে, যেখানে ঝর্ণা মিশিছে হাইওয়েতে। ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা

তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা, অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক বর্ণে

গিরিমল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে

তনু ভরি যৌবন তাপসী অপর্ণা, ঝর্ণা।

ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা যেন এখানে মানুষী রূপে উদ্ভাসিত । হ্যাঁ, খান্ডালায় ।

ফিরে এলাম বাসায়

কিন্তু সত্যি কি তাই ? বাড়িতে আমি কোথায় ?

মনে মনে হয় হিমালয়

কিংবা নর্মদায়

তীরে বসে চা পানে ব্যস্ত সর্ব সময়ে ।

আবার হিমালয়

প্রতিবারই এক অমোঘ আকর্ষণে ছুটে যাই হিমালয়ে । কি যে আমাকে টানে জানিনা। হয়ত পাহাড় , নদী, ঝর্ণা , চা বাগান আর নাক চ্যাপ্টা ছোট চোখের সেই সরল মানুষগুলো যাদের গা থেকে আজও মানবিকতার গন্ধ যায়নি , আজও তাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয় সততা, সহন শীলতা ইত্যাদি শব্দগুলো ।

পুজোর সময়টা আমরা বাংলায় গেলে একটাই চয়েস হয় -- হিমালয় । সারাটা বছর বসে থাকি পাহাড়ের গন্ধ নাকেচোখে মাখার অপেক্ষায় ।

কালিম্পংটা ঘোরা হয়নি । গত বছর গেলাম কালিম্পং-এ । একটি ক্লাউড নাইনের হোটেল আন্তর্জালের মাধ্যমে বুক করে যাওয়া হল । প্রথমে যথারীতি কলকাতা , তারপর সেখান থেকে হিমালয় ।

শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে উঠতেই একঝাঁক হিমেল হাওয়ার পরশে মন ভরে যায় । এক অন্যধরণের সবুজ, চোখের আরাম দেয় ।

একটি মাহিন্দ্রার জীপে করে পৌঁছালাম কালিম্পং । পথে কিছু হালকা খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম । তবে হোটেলটা খুব বড় ছিলনা বলে বোধহয় খাবারের সেরকম স্বাদ ছিলনা । তবুও ওদের শুভেচ্ছা জানালাম , বিখ্যাত উক্তি আছে না --- Diplomacy is to do and say the nastiest things in the nicest way.

দুপুর নাগাদ কালিম্পং গিয়ে স্নান টান সেরে ফ্রেস হয়ে নিলাম । সুন্দর একটি কফিশপ , হোটেলের একতলায় ।

বড় বড় জানালা দিয়ে হিমালয়ের ঐশ্বর্য দেখা যায় , অনুভব করা যায় । দেখা যায় আকাশ চুম্বি বৃক্ষরাজি ও অসমতল সবুজের মাঝে সারিসারি কাঠের বাড়ি , কোন পুরাতন গীর্জা , পাইন বনের ভেজা ভেজা রূপ ।

চা পান করতে করতে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম , সঙ্গে প্ল্যান ছকে নেওয়া , আসন্ন বেড়াবার ।

পাহাড়ি বসতি -- দূরের পাহাড়---

সন্ধ্যে নামার আগে চলে গেলাম ডেলো । বেশ দূরে । একটি পাহাড়ের গায়ে সৃষ্ট ন্যাচারাল পার্ক , ছোট জলাশয়ও আছে । আছে বিতর্কিত নেতা জি এন এল এফের সুবাস ঘিসিংয়ের বিলাসবহুল রিসর্ট । আমাদের অবশ্য ওখানে থাকার ইচ্ছে হলেও উপায় ছিলনা কারণ ফুল বুকড্ । নাহলে হয়ত ক্লাউড নাইন থেকে ওখানেই শিফট করতাম । খুব সুন্দর জায়গাটি । প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি বাগান মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে অনন্য । ঢালু রাস্তা , শান বাঁধানো , দুপাশে অসংখ্য মনভোলানো ফুলের সমাহার , প্রজাপতির পাখনা মেলে উদ্দাম বাতাসকেলি মনে আনে আনন্দঘন ক্ষণ । যা ফুরায় না , অনাবিল , অমল আলোয় পুর্ণ ।

কচি ঘাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে প্রচুর বাঙালী দেখলাম , এই নিরালায় এসেছেন পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে । কিছু আলাপন হল হিমালয়ের কোলে বসে । তারপর সূর্য অস্ত যাবার আগেই রওনা হলাম ক্লাউড নাইন অভিমুখে ।

একজন বললেন ----অনন্যার রান্নাঘরের কথা জানেন ? ইউ- টিউবে দেখবেন । দারুণ শেফ্ উনি । তবে উনি এত সুন্দরী যে মনে হয় ওঁর মুভি স্টার হবার কথা ছিলো !

দেখা গেলো একটা পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে , মনে হচ্ছে কত কাছে কিন্তু রাস্তা ধরে গেলে সে অনেকটা পথ । ডেলোতে বসে বসেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় এত সুন্দর সে হিমরাজ্য । শুধু দুচোখ ভরে হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য্য দেখে যাও । কুয়াশা মাখা পাহাড়ি পথে হারিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই কারণ এই হারিয়ে যাওয়া সবুজের খোঁজে , প্রকৃতির সন্ধানে যা শহুরে জীবন থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে ।

রিসর্টে ফিরে ডিনার সেরে একবারে দোতলায় নিজেদের ঘরে ফিরলাম । কাঠের কটেজ । উন্মুক্ত বারান্দা । চেয়ার পেতে বসলাম । সামনে আকাশ আর পাহাড় এক হয়ে গেছে । আকাশের গায়ে বুটিদার ওড়না , তারা ওড়না । তাদের মধ্যেই কেউ কেউ অরুন্ধতী , স্বাতী , রোহিনী , কৃত্তিকা । আকাশচারী মন খুশিতে মাতাল । মনের

ময়ূর মহলে খুশির বাতাস । নিচে এক ডাচ দম্পতির- গিটার বাজিয়ে গানের সুর মন মাতায় । ওরা প্রতিবছর এই সময় হিমালয়ে আসে এবং কালিম্পং এলে ওঠে এই ক্লাউড নাইনে ।

ম্যানেজার কাম মালিক সাম গুরুংয়ের সঙ্গে বেশ খাতির দেখলাম । ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে চলেছে গপ্পো গুজব । একে ওপরের খোঁজ খবর নেওয়া । আমার এক ভাইয়ের স্ত্রী ডাচ শুনে ওর সঙ্গেও খুব জমে গেলো । আমি পরে ওপরে এসে বরান্দায় বসে বসে ডাচ ভাষায় গান শুনছিলাম । এক নীলচে পাহাড়ের মেয়ে এসে নিঃশব্দে আমার ঘরের মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো । তার মাথায় একটি ক্যাকটাস্ গোঁজা ।

আমাদের জার্মান বন্ধুদের কাছে শুনি ডাচরা খুব অসভ্য হয় , খুব রুড । একজন বন্ধু তো ফিলিপ্স্ ডাচ কোম্পানি শুনে ভির্মি খেয়েছিলেন ---ডাচরা আবার প্রোডাক্টিভ কিছু করে নাকি ?

কিন্তু মজার ব্যাপার হল বিশ্ববিখ্যাত কম্পিউটার সায়ন্টিস্ট যাঁর নামে Algorithm রয়েছে সেই প্রফেসর Dijkstra -- ডাচ ।

পোর্ট্রেট মাস্টার রেমব্রান্ট , Vincent van Gogh ডাচ ; আরো কত উদাহরণ রয়েছে ।

আসলে ঘটি বাঙালের মতন যুগ যুগান্তের লড়াই । নিজেদের মধ্যে এই লড়াই ফুরাবে না । ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান । লাল হলুদ ভার্সেস সবুজ মেরুন । আমি কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার ছিলাম ।

পরদিন যাবো ঋষপ । একটি রিমোট জায়গা । তবে বরফ মাখা হিমালয়ের অপরূপ শোভা দেখা যায় ।

আর এত স্পষ্ট যে মন ভোলায় । ঋষপ থেকে চলে যাবো লাভা লোলেগাঁও । জায়াগটা অসাধারণ , আরো সুন্দর মানুষজন । হাসিখুশি -প্রাণবন্ত । দিনের অনেকটা সময় জায়গাটি কুয়াশায় মোড়া থাকে । ২০০১ সনে পুজোয় যখন এই স্থানে যাই তখন লাভাতে দলাই লামাকে দেখেছিলাম । কোন বৌদ্ধদের ধর্মীয় সম্মেলন ছিল সেখানে উনি হাজির হয়ে উপদেশাবলী পড়ে শোনাচ্ছিলেন ।

ছবিও ছিল-- আমারই তোলা । সবুজ পাহাড়ের গায়ে রং বেরঙের পতাকা ও পোশাকে, বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের মিলন মেলা একটা আলাদা টান আমার শিল্পী সত্ত্বার কাছে । আমি তো রং-এ বাঁচি কাজেই !

বোধি বোধি গেরুয়া রং

শুদ্ধ চেতনা , নো নো নট আইটেম সং !

পাহাড়ি ফুল মানে বাঙালী মেয়েরা আজকাল হিমালয় থেকে স্কাই ডাইভ করছ এরকম সব ভিডিও আমি দেখেছি ইউ-টিউবে ।

এবার সেরকম কিছু চোখে পড়লো না । তবে অনেক বঙ্গবাসীকে দেখলাম কলকাতার ভিড় ভাট্টা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন । ওদের জন্য দু:খ হল কারণ আমি তো অরণ্যের কাছেই বাস করি , সবুজ, বুনোফুল , লাল মটি আমার নিত্য সঙ্গী । কিন্তু ওরা ? এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ওরা ফিরে যাবে সেই ধুলো ধোয়ায়

ভরা লৌহ -কংক্রীট নগরীতে । এই পরিবেশ ট্রান্সফর্মেশন ভারি বেদনাদায়ক আমার কাছে ।

এইসব ভাবছি আর হাঁটছি লোলেগাঁওয়ের একটি পার্কে । বিশাল পার্ক । বড় বড় গাছ হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ।

আছে ফুলের মেলা , উঁচু নিচু পথ , ঠান্ডা তাজা বাতাস আর শিশুদের কলকাকলি , পাখির ডাক , শিস ।

পথপাশে অসংখ্য চা বাগান দেখেছিলাম । আর ভারী ভারী মিলিটারি ট্রাক । একদল সৈনিক তো আমাদের কাছে লিফট নিলেন । ওদের পৌঁছে দিতে হল একটা জায়গায় যেখানে ওদের ট্রাক ওদের জন্য অপেক্ষারত ছিল । আসলে এইসব পথে যান চলাচল খুব কম থাকায় ওরাই বা করবেন কি ?

আর যারা দেশ-মাতৃকার জন্য জীবন দেন তাদের জন্য এইটুকু করা যাবে না ? কিছু মিনেরাল ওয়াটারের বোতলও ওরা নিলেন আমাদের কাছ থেকে । ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম ঋষপ ।

মূল রাস্তা থেকে অনেকটা গেলেই তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা , তা দেখতে হলে এবরো খেবরো ও ভয়ানক বিপদ সঙ্কুল একটি পাথুরে রাস্তা দিয়ে , পাহাড়ি বন পেরিয়ে যেতে হবে একটি স্থানে সেখানে আছে একটি ছোট বাংলো ।

"The rishap tourist centre is one of the first resorts to have come up in Rishap. Managed by a bengali entrepreneur Mr. Pal Babu and his Nepali wife, this is

arguably the best place to stay at Rishap"- পড়েছিলাম একটি ওয়েবসাইটে , এবার সেই হোটেলটি চাক্ষুষ করলাম ।

আর কাঞ্চনজঙ্ঘা ? সুস্পষ্ট , মোহময় । আপাদমস্তক সাদা বরফে মোড়া । হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় । কাঞ্চনজঙ্ঘা এখানে একটি গীতিকাব্য । একরাশ মুগ্ধতা । সূর্যের রশ্মি পড়ে ঝকঝক করছে ।

হঠাৎ চোখে পড়লো একটি ব্যাঙের ছাতা । অনাদরে ফুটে আছে পাহাড়ের বুকে । সেই মাশরুমের চিত্র ক্যামেরা বন্দী করতে পারিনি ।

কাঞ্চনজঙ্ঘার শীতল বাতাস পারলো না বন্ধনে বাঁধতে ।

তুষারমৌলি , ধবল শৃঙ্গকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলাম ক্লাউড নাইনে । আমাদের স্বাগত জানালো না জ্বলে ওঠা সাঁঝবাতির আনাচে কানাচে জড়িয়ে যাওয়া ৯ গুচ্ছ মেঘ । সার্থক কটেজের নামকরণ ।

কিছুক্ষণ পরেই মেঘমালা, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়লো । চারপাশের গাছপালায় এলো সতেজতা । বৃষ্টিধোয়া পথে ভেসে গেলাম নির্জনে । নীচে , অনেকটা দূরে - কোথাও আছে পাহাড়ি গীর্জা । ভেসে আসে পিয়ানোর টু টাং । একটু চলার পরে পাহাড়ের বাঁকে আরেক দফা সুরবাহার । গুলমোহর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে উড়ে এলো । পাহাড়ি ছেলেপুলেদের সঙ্গীতের মূর্ছনা । একযোগে অচেনা সুরে গেয়ে চলেছে । সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র । সুরেলা । সুরে হৃদয়ের ছোঁয়া বেশি । পাহাড় গান গায় । শুনতে শুনতেই আবার নিজ নিকেতনে ।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারান্দায় বসলে দেখা যায় দূরের রেঞ্জটায় রং লেগেছে। দিনান্তের আভায় পাহাড় মায়াময়।

পাহাড় ডাকে আয় আয়। কিন্তু পরদিন যাবো দার্জ্জিলিং। তাই ঐ পাহাড়ের ডাক ভুলে গিয়ে এলাম রেস্তোরাঁতে।

শুরু হল আরেক উপাখ্যান। খানা, গানা আর বাজানা।

জাস্ট চিয়াও চিয়াও, জাস্ট চিয়াও !

একজন বললো : ওরে বাবা নিজেদের ভাষায় গান চালিয়েছে রে !

তখন পাশ থেকে বাংলা বোঝা ম্যানেজার সাহেব বলে উঠলেন : আরে না না এতো হিন্দি গানা আছে, সোনেন নি ?

ম্যায়নে পেয়ার কিউ কিয়া মুভির গানা - জাস্ট চিল চিল !

সাহেবী উচ্চারণের কল্যাণে চিল চিল শোনাচ্ছে : চিয়াও চিয়াও।

তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে নিলাম। তারপর চললো ঘরোয়া আড্ডা। সুখ দু:খের কথা, হাসি তামাশা।

দার্জিলিং গিয়েছি ছোটবেলায়। তেমন মনে নেই। কাজেই পরদিন সেখানে যাবার কথা মনে হতেই উত্তেজনা হতে লাগলো। সঙ্গে আছে লং ড্রাইভের হাতছানি। একটা যুৎসই এস ইউ ভি ভাড়া করে পাড়ি দেবো শৈলশহরের রাণীর দেশে। আর খাঁটি চা জুটবেই জুটবে, একজন চায়ের connoisseur হিসেবে আমার কাছে সেটা

অ্যাডেড অ্যাট্রাকশান । চা বাগান , চা কারখানা দেখলেই হৃদয় জুড়ায় । মনে হয় এই চত্বরেই থেকে যাই চামেলি মেমসাহেবের মতন । কুয়াশাছন্ন কোন প্রভাতে গেয়ে উঠবো নেপালী লোক সঙ্গীত : **রেশম পেরিরি ই-ই-ই- !**

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি-----

দার্জিলিং এ অসাধারণ চা পান করলাম । সারা জীবন মনে থাকবে । সঙ্গে অদ্ভুত এক স্যান্ডউইচ । অদ্ভুত কারণ ভেতরে কাবাব ভরা । কাবাব স্যান্ডউইচ । আর কালিম্পং থেকে দার্জিলিং যাবার সময় এক অভিনব পথ ধরে গেলাম । ড্রাইভার বললো সেটা শর্ট কাট । অপরূপ ফুলের শোভা আর ধবল পাহাড় দেখতে দেখতে এক সময় চলে এলো কুয়াশা ঢাকা শৈলশহরের রাণী সাহেবা । পাশ দিয়ে চলেছে ঘস ঘস শব্দ করে টয় ট্রেন । কালো ইঞ্জিন - বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে , খাদের ধার দিয়ে । টুকরো টুকরো ভালোলাগা জুড়ে আমার দার্জিলিং । খাদের ধারের রেলিংটা, সেই দুষ্টু দোদো শিরিঙটা ---আমার শৈশবের দার্জিলিংটা, অঞ্জন দত্তের গান গেয়ে উঠলাম । সেন্ট পলস্-এ পড়ার সময়কার কথা গানে লিপিবদ্ধ করেছেন হয়ত । আমার এক বন্ধু ছিল সেও সেন্ট পলস্-এ পড়তো । ছুটিতে যখন কলকাতায় আসতো আমি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে দিতাম --- ঘোড়ায় চড়িস্ ? খাদে নামিস্ ? ট্রেক করে কোথায় যাস ? পিয়ানোতে কি সুর তুলিস ? মেঘ এসে যখন স্নান করায় তখন কেমন লাগে রে ?

বেচারা জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে যেতো । কল্পনাপ্রবণ মন হলে প্রশ্ন আসার কোন কমতি হয়না যে !

সেও আজ দোদো শিরিঙ এর মতন কোথায় হারিয়ে গেছে ! খাদে নামার সময় হাতটা ধরলে ভালই লাগতো - রীতিমতন হ্যান্ডসাম ছিল ! আর বিশাল ধনীর পুত্র। ধনী বন্ধু থাকা সবসময়ই ভালো ☺

আমার মা, আমাকে দার্জিলিং এর কনভেন্টে ভর্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা আমাকে হোস্টেলে যেতে দেবেন না। তাই দার্জিলিং-এর কথা মনে হলেই বুকে এক বিরাট এমটিনেস্ দেখা দেয়।

যদি ওখানে হোস্টেলে পড়তাম তাহলে কত ভালো হত ---এইসব ভেবে।

কালিম্পং-এ আছে ক্যাকটাসের বাগান। বেশিরভাগই লালিত পালিত হচ্ছে স্থানীয় মানুষের ছত্রছায়ায়। বিভিন্ন রকমের ক্যাকটাস ও অর্কিড নিয়ে ক্যাকটাস হাউজগুলো আলাদা আকর্ষণ। আমরা কয়েকটা ঘুরে দেখলাম ---অসাধারণ ! বটানিস্ট নই কিন্তু বেশ কিছু স্পিসিস চিনতে পারলাম। বিশেষ করে সোনার কেল্লার **শনিমনসা** যাতে শনিবারে শনিবারে ফুল ফোটে সেটি।

পাহাড়ি সুন্দরী, লাল লাল -আপেল গাল নিয়ে সেবায় নিযুক্ত। তুলতুলে হাতের স্পর্শে কন্টক বনে ফুল এসেছে। নরম কলিরা নিঠুর কাঁটার মাঝে আপন আনন্দে জাগ্রত। সাদা লোমওয়ালা আইসক্রিমের মতন কিছু কুকুর দেখলাম -- ছো ছুইট্ ।

পাহাড়ে স্নান করা শিখছে। গান বাজছে :: আন্ডার ওয়াটার !

আদর করে দিলাম। তবে দেখতে নরম হলে কি হয় ভীষণ তেজি। কি বাজখাঁই গলার আওয়াজ ! ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

রডোডেন্ড্রন

হিমালয়ে তো রডোডেন্ড্রনের ছড়াছড়ি । কত রকমের সাজে সেজেছে । খুব সুন্দর । নয়ন জুড়ানো । কত শত পর্বতারোহী তো এই ফুলের শোভা দেখতেই প্রতিবছর হিমালয়ে ছুটে ছুটে যান । আমরাও ক্যাকটাসের উপবন পেরিয়ে গেলাম ফুলের বনে । ফুল দেখতে , ফুল ছুঁতে ।

ক্যাকটাসের উপবনে

আজব ধরণের ক্যাকটাস সেসব । কোনোটা ঢোলের মতন তো কোনটা আকাশী রঙের তো কোনোটা সাপের ফণার মতন । রাশি রাশি ক্যাকটাস দেখে মনে হল আমরা শুধু শুধু ফুল দিয়ে ঘর সাজাই । রূপসী কাঁটাও তো হয় ! কন্টক ফোটার ভয়, জয় করতে পারলে কাঁটার ফুটে ওঠা দেখতে ভালই লাগবে । কাঁটাতেও ফুল ফোটে । যদিও খুবই ছোট্ট সেইসব পুষ্প , তবুও সপুষ্পক ক্যাকটাস দেখার মজাই আলাদা ।

লোলেগাঁওয়ের পথে- জঙ্গল

অসাধারণ পাইন বন পেরিয়ে লোলেগাঁও ঘুরে চলে গেলাম এক মনাস্ট্রীতে । সেখানে বেশ খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয় । জায়গাটার নামটা আমার মনে নেই যদিও । কাউকে দেখা গেলো না আশেপাশে । শুন্য প্রান্তরে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে । বুদ্ধদেবের

মূর্তির সামনে একটি ধূপের জায়গা রাখা । সুন্দর ভেষজ সুবাস আসছে । আমিও একটি ধূপ জ্বালিয়ে দিলাম ।

জানা গেলো এই মনাস্ট্রিতে একটি গুম্ফা আছে সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ তপস্যা করেন । টানা দু -তিনবছর ধরে তাঁরা ধ্যান করেন । বাইরে বেরোন না । একটি ছাগল আছে, সেটিও টানা দু-তিনবছর পর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাইরে আসে । অদ্ভূত ঘটনা । ধ্যানে যে প্রশান্তি তাতে অবগাহন করা গেলে ঘড়ির কাঁটার দিকে আর মন থাকেনা । সময় স্তব্ধ হয়ে , থমকে দাঁড়ায় ধ্যানমগ্ন ঋষির দুয়ারে , তাই ছাগশিশুরও ।

কত রং বেরঙের পেন্টিং গুম্ফার দেওয়াল জুড়ে !

সোনালী ঘন্টা , বড় ড্রাম , দ্রিম দ্রিম করে মনে মনে বাজিয়ে নিলাম । আমার আবার সব কিছু একটু মনে মনে করে নেবার অভ্যাস আছে । মনে পড়ে একবার হিমালয়েই , সিকিমে White water rafting করার সুযোগ এসেছিল । সময়াভাবে করা হয়নি । একদঙ্গল টগবগে যুবক ছিল সঙ্গে । সবাই এই অ্যাডভেঞ্চার হলনা বলে কষ্ট পাচ্ছিল । এমন সময় আমি বলে উঠি : কি দারুণ এনজয় করলাম না তিস্তার বুকে White water rafting—?ওরা অবাক চোখে চেয়ে রইলো । একজন বললো- কখন করলি ? হেসে উঠলাম : হা হা হা হা করেছি ব্রাদার করেছি তোমার জা-আন্তি পারোনি ! মনে মনে করেছি কিনা !

আমরা নিচে এসে গাড়িতে বসলাম । খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করে পা ব্যাথা হয়ে গেছে । একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার কালিম্পং

অভিমুখে যাত্রা করলাম । ফেরার সময় কালিম্পংয়ে এক নেতা খুন হওয়ায় একদিন <u>**বন্ধ**</u> ছিল । আমরাও গৃহবন্দী রইলাম ।

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে কেউ । হোটেলের মালিক হা হুতাশ করছিলেন ।

সেইদিন আশেপাশে হেঁটে বেড়ালাম । পাকদন্ডী বেয়ে নেমে গেলাম পাহাড়ি গ্রামে । স্থানীয় মানুষদের পর্যবেক্ষণে কেটে গেল দিনটা । পরদিন শিলিগুড়ি চলে গেলাম ।

বিমান বন্দরে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম । আগে একবার আমার প্রিয় অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়কে দেখেছিলাম এইখানেই । কিন্তু এবার ওঁনাকে দেখা গেলো না । বদলে কিছু লো-কস্ট ক্যারিয়ারের যাত্রীকে দেখলাম । একজন কিভাবে প্লেনের জানালা খুলে বসবেন তাই পরিবারের সদস্যদের বোঝাচ্ছেন । মাইনাস তাপমাত্রায় জানালা খুলে বসলে (যদিও বা খোলে) অচিরেই যে স্বর্গে পৌঁছাবেন ভেবে দু:খ হল । অবশ্য আকাশে ওড়া মানেই তো স্বর্গের কাছাকাছি চলে যাওয়া । এইসব লো -কস্ট এয়ার লাইনে আজকাল এয়ার হোস্টেসদের শ্লীলতাহানি হচ্ছে বলে খবরে কাগজে পড়ছিলাম , আবার অত্যন্ত বয়স্ক পাইলট এইসব প্লেন চালায় যারা বিদেশে লাইসেন্স পায়না সেটাও খবরের কাগজে পড়া । কাজেই সীমিত ক্ষমতা অথচ আর্জেন্সী --হলে আলাদা কথা নাহলে সুরক্ষার খাতিরেই এইসব এয়ার লাইন্স করে কোথাও যাওয়া কতটা সেফ তা জানিনা ।

২০০৩/৪ সনে আমার প্রিয় অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় আমাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে এলেন কলকাতা । তবে মজার ব্যাপার হল আমরা

চুনোপুটিরা এসেছিলাম জেট এয়ারওয়েজ এর বিজনেস ক্লাসে আর উনি এসেছিলেন ইকোনমি ক্লাসে । তাই ফ্লাইটে ওঁনার পাশে বসে আসবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম । পরে চালিয়াতি করার সুযোগ হারালাম !

----হে হে , দেবশ্রী আমাকে ফ্রি হাগ আর ফ্রি কিস দিয়েছেন !!

পাহাড় আমায় ডাকে , ইট , কাঠ , কংক্রীটের নগর আর টানে না । জন্ম শহরটাকে দুমরে মুচরে ফেলে বাপীদার বেগুনি , সিঙ্গারা , মাটির ভাড়ের আদা দেওয়া গরম চা ভুলে - হিমালয় কোলে সোজা এসে পাখনা মেলি । প্রজাপতি হই । নীল পাহাড় , সবুজ পাইন বনের ঘন ছায়ায় হারিয়ে ফেলি শহুরে সত্তা ।

দ্রাবিড় সুন্দরীর - ভ্রমর আঁখির আহবান যেমন ডোবায়

তেমনই ডুবে যাই আপেল সুন্দরীর লালিমায় । পাহাড় আমায় ডোবায় । পাহাড় আমায় ভাবায় , অবশ্যই পাহাড়ের নাম হিমালয় ।

প্রতিবার আসি , প্রতিবছর আসতে চাই । তবুও আশ মেটেনা । বিদেশে কেন সেটল করার কথা ভাবিনি ! (এটা ওল্ড প্রশ্ন এখন) প্রশ্নটা এতবার শুনেছি দেশী-বিদেশী বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে যে পুরনো গিটারের বাজনার মতন লাগে ।

উত্তরে আজ যদি বলি স্রেফ হিমালয়ের টানে বিশ্বাস হবে কি ?

অস্ট্রেলিয়াতেও আমাকে হিমালয় সুড়সুড়ি দেয় !

এখানে অন্যভুবন ! পড়শীর বাবা ডোনেট ক্রেজি । সারাদিন নানান সংস্থায় ডোনেট করেন । ওর কাজই হল সংস্থা খুঁজে বার করে ডোনেশান দেওয়া ---- লোকের কত প্রয়োজন টাকাপয়সার !

পড়শী নিজে রিটায়ার করেছে । ২৫বছর চাকরি করে এখন দম নিচ্ছে । ওর স্বামী লোকের বাড়ি গিয়ে বাগান সাফ করে । আগে প্রফেসরি করতো । বাগান সাফের এক ওয়েবসাইট আছে ওর ; সেটা পেটেন্ট করেছে । অর্থাৎ কেউ আর ঐ বিজনেস মডেল কপি করতে পারবে না ।

সে যাইহোক্ পড়শী এখন নিজের স্বামীর গাড়ি চালায় । পতিদেবের এক আজব ব্যামো আছে । তাই গাড়ি চালানো নিষেধ । ভদ্রমহিলা গাড়ি চালিয়ে সর্বত্র নিয়ে যায়, বদলে মাসে মাসে মাইনে নেয় ।

আরেক ব্যাক্তির কথা শুনেছি যে ইংল্যান্ড থেকে এসেছে । সাদাচামড়া-সাহেব । তার এখানে বাচ্চা হয়েছে । সেই বাচ্চাকে অ্যাব-অরিজিন বলে মার্ক করে দিয়েছে হাসপাতালের কাগজে ।

কারণ আমাদের এস-সি , এস-টির মতন পড়াসোনা ফিরি হইয়া জাইবো ! অর্থাৎ চোর সবখানেই ।

মেলবোর্নের পাড়ায়, এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিলো, তার অট্টালিকার মতন বাসস্থান । আমার স্বামী একদিন বাড়িটি দেখিয়ে শুধান : এটা কার বাড়ি গো ? সে বলে ওঠে : এটা আমার বাড়ি ।

অন্যের নাম করে লেখা , অন্যের জবানীতে

ধৌলাধরের আলোছায়াতে

ধর্মশালা গিয়েছিলাম যেই পথে তা হল :

দিল্লী - অম্বালা-খরার - রোপার-কিরাতপুর-আনন্দপুরসাহিব-নাঙ্গাল-উনা-আম্বি- মুবারকপুর- ভারওয়াইন (চিন্তপুর্নি) - দেহরা-রাণীতাল-কাংড়া-ধর্মশালা , প্রায় ৫০০ কিলোমিটার ।

ব্যাঙ্গালোর থেকে বিমানে দিল্লী তারপরে ক্যাবে ধর্মশালা । ওপরের বিস্তারিত পথে চলতে চলতে পৌঁছালাম ধর্মশালাতে । ক্লাব মহিন্দ্রার ফাইভ স্টার রিসর্টে প্রায় মধ্যরাতে । সঙ্গে ছিলেন সোনাঝুরি সম্পাদিকা ও তাঁর ধর্মপতি ।

গভীর রাতে হিমাচল প্রদেশের গভর্নরের দেওয়া পার্টিতে আমরা অনাহুত অতিথি ।

নি:শব্দে ঢুকে গেলাম কাঠের সুন্দর দোতলা কেবিনে । একটি ঘরের ভেতরেই ডাইনিং হল তার চেয়ে নিচে নেমে গেলে আমার শোবার ঘর আর হলের মধ্যেই একটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে সম্পাদিকার ঘর । পুরোটাই কাঠের । ঝকঝকে তকতকে ।

এত রাতে খাবার পাওয়া যাবেনা বলে জানা গেলো । যদিও আমরা চন্ডীগড় থেকেই ফোন করে দিয়েছিলাম যে আমাদের পৌঁছতে অনেক রাতে হয়ে যাবে । তবুও কেন খাবারের ব্যবস্থা ছিলনা বোঝা গেলোনা । অনুরোধ করা হল । ওরা জানালো পার্টির কিছু একস্ট্রা খাবার আছে সবই ভেজ ডিশ যদি খেতে চান আমরা দিতে পারি । তাই সই ।

ভাত, ডাল(কালো ডাল) , সবজি, আইসক্রীম আর পকোড়া । এই দিয়ে ডিনার সেরে লুটিয়ে পড়লাম বিছানায় । ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম আসলে, সকালে দিল্লী পৌঁছে তারপর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি নিয়ে (আগেই ভাড়া করা ছিল) গন্তব্যস্থলে যেতে যেতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম ।

পরের দিন ভোরে উঠে দেখলাম ডাইনিং হল থেকে ধৌলাধরের বিশাল রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে । সাদা বরফ তার ওপরে সুর্যের রশ্মি পরে চক্‌চক্‌ করছে । পুরো পাহাড়টাই যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায় । দারুণ লাগছিলো । হেঁটে এলাম বাগানে সেখান থেকে আরো পরিস্কার রেঞ্জটা দেখা গেলো ।

প্রাতরাশ সেরে নিলাম । আমি আগে মহিন্দ্রার রিসর্টে থাকিনি । এবারই প্রথম থাকা কিন্তু খাবার দাবারের অবস্থা শোচনীয় । রিসর্ট গ্রেডের এই স্টার প্রপার্টিতে একমাত্র বোধহয় ভারতেই এগুলো সম্ভব । মেনুকার্ডে অসংখ্য ভুল । গ্রেভি বলে ড্রাই নিয়ে আসছে আর খাবারের স্বাদ অতীব খারাপ । বিরিয়ানি তো আজকাল রাজার ঘর থেকে পথে চলে আসাতে এমনই স্বাদের তৈরি হচ্ছে যে মুখে দেওয়া

চলেনা । মাংস সেদ্ধ করে নিয়ে চালে মিশিয়ে দেওয়া হয় । আসল বিরিয়ানির মশলাপাতিও দেওয়া হয়না । অনেক সময় দেখেছি ধনেপাতা , নারিকেল দিয়ে দেওয়া হয় আর হলুদের গন্ধে খাওয়া দায় । পুরো মাটি বিরিয়ানি । এখানেও প্রায় এরকমই অখাদ্য একটা বিরিয়ানি খেলাম । বেশ বাজে লাগলো । কিছু কিছু জিনিস রয়্যাল ক্লাসই চলে , সব জিনিসকে বোধহয় সর্বহারার জন্য করা যায়না বা উচিৎও নয় । কমিউনিস্টরা যতই চোখ রাঙা করুক ।

যাইহোক পরে আমরা একটি তিব্বতী মনাস্ট্রি দেখতে গেলাম McLeodganj , সেখানে স্বয়ং দলাই লামা বসবাস করেন । একটি বৌদ্ধ্য প্যাগোডা যেমন হওয়া উচিৎ ঠিক সেরকমই । পদ্মসম্ভব, বুদ্ধ , অবলোকতেশ্বর ইত্যাদির বড় বড় চিত্র রয়েছে ।

এই জায়গাটি কাংড়া উপত্যকার প্রশাসনিক শহর ।

এছাড়া কুনাল পাথরি , ওয়ার মেমোরিয়ল দেখা হল । একটি মন্দির অন্যটি হিমাচলের সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর স্থল । সেটি পাহাড়ি বাঁকে , পাইনের বনে মধ্যে অবস্থিত । মন্দির থেকে ধৌলাধর রেঞ্জ পরিস্কার দেখা যায় ।

১১ কিলোমিটার দূরে আছে ডাল লেক । দেবদারু গাছের ছায়ায় ছায়ায় কিন্তু লেকটি খুব একটা স্বচ্ছ মনে হলনা । সৌন্দর্য্যও তেমন কিছু অনুভব করলাম না । কলকাতা শহরেই ওরকম অনেক লেক আছে । সেন্ট জনস্ চার্চে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড এল্গিন এর সমাধিস্থল আছে । উনি ধর্মশালাতে ১৮৬৩ সালে মারা গিয়েছিলেন ।

ভাগসুনাগ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে চলুন ১১ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন মন্দির ভাগসুনাথে ।

ঠান্ডা জলে স্নান করুন , মানা হয় , সেই বারিধারা পূণ্যতোয়া ।

গীতা বিশেষজ্ঞ স্বামী চিন্ময়ানন্দ মিশন আশ্রমে ঘুরলাম । শান্ত আশ্রম হলেও বেশির ভাগটাই বন্ধ ছিল , দেখা হলনা । এই আশ্রমটি বিন্দু সরস তীরে অবস্থিত ।

নর্বুলিঙ্ক ইন্সটিটিউটে তিব্বতী হস্তশিল্পের সম্ভার আছে , সেখানে বৌদ্ধ্যধর্ম সম্পর্কে শেখানো হয় বলে জানলাম । সবই পাহাড়ের কোলে ঘন পাইন ফার বার্চে ছাওয়া রাজ্য । শীতল , সবুজ স্নিগ্ধ ।

পরের দিন গেলাম জ্বালামুখি । এখানে পাহাড়ের গা থেকে একটি প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন হওয়া আগুনের শিখা জ্বলে যাকে মানুষেরা দেবী জ্ঞানে পুজো করে । বেশ উৎসাহ নিয়ে গেলেও দেখা গেলো জায়গাটা তেমন আকর্ষক নয় ।

মন্দিরে ওঠার রাস্তা খুব সরু এবং পাহাড়ের গা বেয়ে বলে স্টিপ । আর মন্দিরের ভেতরে ঘিঞ্জি ও মনোরম কিংবা পরিস্কার নয় । একটা ঘর আছে সেখানে ঢুকে গেলে দেখা যায় নিচে জ্বলছে ঐ নীলাভ অগ্নিশিখা কিন্তু সেটি খুব সরু ও পাথরের খাঁজের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে । দেখে এলাম ।

জানা গেলো একটি তামার তারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালিয়ে দেবী রূপে পুজো করা হয় । আমাদের --মন্দির ও কনসেপ্ট খুব একটা পছন্দ হয়নি । অবশ্য সমস্ত ধর্মস্থানে তো নোংরা আর লোকের কোলাহল ।

সম্রাট আকবর নাকি একবার দেবীকে অসম্মান করাতে ওঁনার বিপদ হয় । তারপর দেবীর পুজো দেন -তাতে তুষ্ট হয়ে দেবী ওঁনাকে মাফ করেন এবং সম্রাট খুশি হয়ে মন্দিরের চুড়ায় সোনা দেন । অনেক গল্পই শোনা গেলো । জায়গাটা অতীব নোংরা ধরণের ।

মন্দির থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে গেলাম দোকানে , চা টা খেলাম ।

তারপর চলে গেলাম চিন্তপুর্ণি বাংলায় বোধহয় হবে ছিন্নমস্তা ওরা বললো - ছিন মস্তিকা । এখানে সতীর পায়ের পাতা পড়েছিলো । এটা হিন্দুদের এক প্রধান শক্তি পীঠ ।

ধর্মশালা থেকে এটা ৮০ কিমির মতন ।

এখানে নবরাত্রিতে খুব ভক্ত সমাগম হয় । অনেকটা খাড়া রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠতে হয় । আমি গেলাম । সম্পাদিকা ও শান্তনুদা নিচে ছিলেন । ওঁনারা একটি হোটেল বসে চা ইত্যাদি পান করছিলেন । আমি ঘুরে এলাম । মন্দিরে খুব ভীড় ছিল ।

সেখানে দেখলাম দেবী কালো রঙের ;মনে হয় বিভিন্ন জিনিসে আবৃত শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে --একটি বড় হীরে কিংবা অন্য কোনো দামী পাথর ।

এই দেবী সব ইচ্ছাপুরণ করেন বলে জানলাম যদিও গার্গীদি মানে সম্পাদিকা জানালেন যে আজ অবধি উনি যত ইচ্ছেপুরণ মনাস্ট্রি কিংবা মন্দিরে গিয়ে ইচ্ছে নিবেদন করেছেন একটাও সেই দেবদেবীরা অথবা লামাগণ পূরণ করতে পারেন নি ।

St. John Church এ গেলে, জায়গার সৌন্দর্য্য মন ভরালেও চার্চটার বিশেষত্ব কিছু চোখে পড়লো না যদিও এই চার্চ বৃটিশদের একটি প্রধান চার্চ ছিল সেইসময় ।

চিন্তপূর্ণি ছেড়ে চলে এলাম মহিন্দ্রায় ।

আবার ডুব দিলাম আলস্যে , আড্ডায় । ঘরোয়া আড্ডায় কেটে গেলো সন্ধ্যে ।

আমরা অনেক জায়গায় যাইনি । অন্যরা যেতে পারেন ।

মাসরুরে অনেকটা ইলোরার মতন গঠনের মন্দির আছে । ১৫টি মন্দির মোনোলিথিক রক টেম্পেল । এছাড়া আছে কাংড়া আর্ট মিউজিয়াম । সেখানে কাংড়া সংস্কৃতির সব শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে । মহারাণা প্রতাপসাগর লেক বিপাশা নদীকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে । ছিল ড্যাম- তাই লেক । এখানে প্রচুর পাখি ও মাছ দেখা যায় । আগে একে পং লেকও বলা হত বলে শুনলাম ।

তাতওয়ানিতে আছে হট স্প্রিং আর মাছিরিয়ালে জলপ্রপাত । বেশি দূরে নয় । ২৮২৭ মি উচ্চতায় আছে ত্রিউন্দ । এটা মাত্র ১৭ কিমি ধর্মশালা থেকে -আর ধৌলাধরের পাদদেশে । ইল্লাকুয়া থেকে বরফ পাবেন । পিকনিক স্পট ।

নূরপুরে আছে কেল্লা ; বানিয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর । নূরজাহানের নাম করে ।এখানে কৃষ্ণমন্দিরও আছে ।

পশমের পোশাকের জন্য এই স্থান বিখ্যাত । কাংড়ার ছোট শহর ধমেতার ৩ কিমি পূর্বে আছে বাথু মন্দির । এখানে প্রাচীন মন্দিরের অংশ ৮মাস জলের তলায় থাকে । কিন্তু মার্চ থেকে জুন থাকে মানুষের চোখের সামনে । কাংড়া ভ্যালিকে পূর্বে ত্রিগর্ত বলা হত ।

রমণীয় জায়গা , দেখার মতন । ৩৫০০ বছর আগে থেকে এই স্থান রয়েছে সুন্দর পাহাড়ি স্থান হিসেবে । বৈদিক যুগেও এর রমরমা ছিল বলে জানা গেলো । ব্রজেশ্বরী মন্দির দেখা যাবে শহরে । এটি নামী মন্দির । হিমালয় তো মন্দিরের দেশ । ১৫ কিমি দূরে চামুন্ডা মন্দির । বনের ঝর্ণার ডানদিকে ধৌলাধর পাহাড়ের সামনে এই মন্দির । তবেই বুঝে নিন কত সুন্দর জায়গা । লাহালা জঙ্গল , শিবলিঙ্গ, পাহাড় সব মিলিয়ে অপুর্ব । তবু এত যে মন্দির কোনোটাই যেন সেই শান্তি দিতে পারেনা । টাইলস্ , গ্রিল, সিমেন্ট দিয়ে এত জবরজং করে দিয়েছে যে মন্দিরের প্রাচীনত্ব নষ্ট হয়ে গেছে ।

কিছু দেখলাম, কিছু দেখিনি । কিন্তু জেনে নিলাম --পরে কখনো দেখবো ।

দলাই লামাকে দেখেছিলাম, লাভা লোলেগাঁওতে ।ওঁনার বাড়ি যেতে আমরা আগ্রহী ছিলাম না ।

এখানে কমিউনিস্ট সরকারের অত্যাচারের কথা নথিবদ্ধ করা আছে তিব্বতী সংস্থায় । লোকেরা বিশেষ করে বিদেশীরা, কমিউনিস্টদের খুব গালাগালি করছিলেন ।

আমরা দেখলাম। চীনাদের অত্যাচারের বিভিন্ন নজির ওখানে ডিসপ্লে করা আছে । যারা মানুষের কথা বলে তারাই আবার অন্য মানুষের ওপরে এইরকম বর্বরভাবে অত্যাচার করে কি করে সেটাই অবাক লাগার মতন ব্যাপার । অবশ্য কমিউনিস্টরা তো চিরকালই হিপোক্রীটের বংশধর ! কারণ ওরা যা প্রচার করে তা মানা অত সহজ নয় ।

যাবার সময় চন্ডীগড়ের কাছে একটি ধাবায় খেতে বসেছিলাম । সেখানে কিছুতেই আমাদের তিন প্লেট পকোড়া দেবেনা । শেষমেশ মালিক নিজেই চলে এলো । এসে বারণ করলো-- বললো- নষ্ট করবেন । আমরা বললাম , পয়সা দিয়ে কিনে নিচ্ছি তো।

তবুও সে দেবেনা । যাইহোক অনেক কষ্টে তাকে কনভিন্স করানো গেলো । ফেরার সময় সেই ধাবায় আর ঢুকিনি ।

আর এরকম বিপদও হয়নি ।

যাবার সময় সারা পাঞ্জাব জুড়ে, সবুজ সবুজ ক্ষেতের পাশেই- রাস্তায় এত সুন্দর সুন্দর পাখি দেখলাম যে বলার নয় । হাইওয়েতে তো কম যাইনি কিন্তু এত পাখি কোনোদিন দেখিনি । গ্রাম বাংলার ধান ক্ষেতের কথা মনে পড়িয়ে দেয় । টিয়া , দোয়েল, ফিঙে , বৌ কথা কও আরো কত নাম না জানা উড়ন্ত চেতনা । বাংলার কত গ্রামে দেখেছি । ছায়া সুনিবিড় , শান্তির নীড় , ছোট ছোট গ্রামগুলো ।

সঙ্গে বিভিন্ন রং এর পাগড়ি । হলুদ, বাসন্তী , লাল , সবুজ, নীল, গোলাপি । সব পাগড়ি হুউশ- হুউশ করে স্কুটারে চড়ে উড়ে যাচ্ছে ।

যথাসময় দিল্লী ঢোকার আগে- একটা জায়গায় বিশাল বড় খাবার জায়গায় খেয়ে নিলাম । আজকাল তো বড় জায়গা মানেই উগ্রহানার ভয় ! তারপর রাইট টাইমে চলে গেলাম বিমানবন্দরে । রাজ বব্বরের সঙ্গে একই ফ্লাইটে না এলেও- ওঁনাকে দেখলাম । প্লেনে উঠে সীটে বসতেই দেখা গেলো ক্রুরা ব্যস্ত কাজে আমাদের যাত্রা সুখদায়ক করার জন্য যাতে আপনাদের জন্য এই ভ্রমণ কাহিনী লিখে ফেলতে পারি !

লিখে কি আর ফেলা যায় ? হিমালয় মানেই মূর্তিমান নির্মলতা । তাকে ছুঁতে হয় ভ্রমণ আলেখ্য পড়ে বোঝা যায়না ।

****

এইসব বিহরণের গল্প বলে আবার অন্য কথা শুরু করলাম । শকুনি নাকি অনেক জায়গায় গেছে । এবার সে নিজে শুরু করলো ভ্রমণ উপাখ্যান !

প্রথমে রাজস্থান । একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে নিজের মা ও ভাইদের সাথে ওখানে যায় । শকুনির মা একজন থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট । অনেক সাহেব ঐ কনফারেন্সে এসেছেন । বড় বড় বিজ্ঞানী সবাই । রাজধানী এক্সপ্রেসে করে এক শীতের সকালে দিল্লী যায় । সেদিন কুয়াশার কারণে ট্রেন লেট । আবার সেইদিনই চেতক এক্সপ্রেস একদম রাইট টাইমে ছাড়ে । কাজেই ট্রেন মিস হয় শকুনির । সারাটা দিন স্টেশানে অপেক্ষা করে, প্রায় মধ্যরাতে অন্য ট্রেনে চড়ে সে যায় আরো দূরে । প্রবল শীতে জেনেরাল কামরায় উঠে বসে --কারণ রিসার্ভেশান ছিলো না । হাড় কাঁপানি ঠান্ডায় ভোর চারটের সময় সমস্ত মালপত্র নিয়ে নামে আরেকটি স্টেশানে । সেখান থেকে অন্য ট্রেন ধরে যাবে উদয়পুর । সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় যাত্রা চলে । মাঝে কিছু ভেন্ডারের বিক্রি করা ক্যাপসিকামের বড়া খেয়ে ক্ষুধা মেটে ।

বিকেল নাগাদ পৌঁছায় উদয়পুরে । সেখান থেকে একটি গুজরাতি হোটেলে যায় । পেট ভরে খেয়ে নেয় আগে । ওরা যখন চাউল দিতে চেয়েছে তখন শকুনি অবাঙালী হওয়া সত্ত্বেও ভেবেছিলো যে চাউল মানে কাঁচা চাল । কিন্তু জানা গেলো যে ওটা ভাতের অবাঙালী নাম ।

একেবারে নিরামিষ খেতে শকুনির কোনোদিনই ভালোলাগেনা ।

কোনোক্রমে খেয়ে নিলো । সারাদিন যা ধকল গেছে !

কনফারেন্সে এক সিংজীর সাথে পরিচয় হল ।

ভদ্রলোক থিওরেটিক্যাল ফিজিসিস্ট !

অবাক হল শকুনি । কারণ তার মতে বুদ্ধি একমাত্র শকুনি বংশের মানুষদেরই আছে । সর্দারজীর সাথে ফিজিক্স তাও থিওরেটিক্যাল -- এটা কেমন বেমানান ।

পরদিন উদয়পুর শহর ঘুরে দেখা হল । এত সুন্দর লেক ও বাগিচা যে চোখ জুড়িয়ে যায় ! মরুশহরে এত জল, তাও সত্যি সত্যি জলরাশি । মরীচিকা নয় । অসাধারণ লাগলো । ইচ্ছে করলেই জল পান করা যাবে ! শুষ্ক বালি আর তপ্ত মরুর মাঝে, আঁজলা ভরে শান্তিবারি রেখেছে উদয়পুর । প্রতিটি কোণে কোণে !

সারাদিন ধরে শহরটা ঘুরে দেখে নিলো । হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত রাণা যখন চেতকের পিঠে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যান ও পরে চেতক মারা যায় সেই সংক্রান্ত সব গল্প শুনে শকুনির খুব মজা লাগছিলো । নিজ যুদ্ধের কথা মনে পড়ে যায় !

এখানে বলে রাখা ভালো যে শকুনি উদয়পুরে খেলো আজব খানা !

কুমড়োর ভর্তা , নারিকেল দিয়ে রান্না করা ভাত মানে কোকোনাট রাইস আর লাউয়ের ক্ষীর । একজন বিহারী মহিলা এগুলি রান্না করে দিলো । ওর হাতে অনেক কাচের চুড়ি । **খানা পাকানোর** (রন্ধন) সময় ঝনঝন করে বাজচ্ছিলো সেই চুড়ি !

বিহারী মহিলা জানতে চাইলো সুকুর কাছে যে ইলিশ মাছ যখন রাতভর ইলিশ হিসেবে রান্না করা হয় তখন ওতে এত টক কেন দেওয়া হয় । ভিনেগার , টমেটো সস্, লেবুর রস , দই এসব দিলে তো ইলিশ মাছ রাতভর ইলিশ না হয়ে টকভর ইলিশ হয়ে ফুলিশ ভাবে তাকিয়ে থাকবে !

সুকু কী উত্তর দিয়েছিলো বলেনি । শুধু জানা গেলো যে বিহারে গিয়ে অনেক কিছু ঘুরে দেখেছে সে । একটি গ্রামীণ অঞ্চলে ছিলো । সেখানে সমস্ত খাটা টয়লেট । মলের মালসা সিস্টেম আছে । সুকুর ভয় করছিলো যে গর্তের মধ্যে দিয়ে খাটার ঐ মালসায় পড়ে যাবে না তো !

একটি রেলের কোয়ার্টারে ছিলো অতিথি হয়ে । সেখানে ভালোলেগেছে । আতিথেয়তা সুমধুর । একটু দূরে শ্মশান । নিত্য নতুন মড়া পোড়ানো দেখা যায় । গা ছমছম করে বৈকি !

বিশেষ করে রাতে । তখন ঐ বিহারী রমণী রাতভর ইলিশ বানিয়ে খাওয়ালো । ইলিশ মাছের পুরো কাঁটা এমনভাবে নরম হয়ে যাবে যে এমনিই খাওয়া যাবে । কাঁচের চুড়িতে সেতারের ঝঙ্কার তুলে যখন রান্না করলো তখন কিন্তু এত টক দেয়নি ।

পরেরদিন এক পড়শী , মহাভারত থেকে শকুনি এসেছেন শুনে দেখা করতে আসে । সে রেঁধে খাওয়ায় অন্য মাছ । তবে মাছটি কাঁচা অবস্থায় ঝোলে দেওয়াতে কেমন তাকিয়ে ছিলো আর আঁশটে গন্ধ

ছিলো । ঝোলটা ভালই ছিলো । আরেকজন আঁশ সমেত মাছ রান্না করে দেয় । প্রশ্ন করলে বলে : আমার বঠি নেই তো কী করবো !

অনেক দেশে নাকি আঁশ সমেত মাছ রান্না করে খায় মানুষ । আর আঁশ ভাজা তো খুবই সুস্বাদু । কাজেই সুকু খেয়ে নিলো ।

বিহারী ঐ মহিলার প্রশ্নের উত্তরে জানালো যে রাতভর ইলিশ রান্নাতে এত টক দিয়ে ওকে টকভর ইলিশ করা হচ্ছে হয়ত কোনো দক্ষিণীর পরামর্শে । ফিউশান ফুড যাকে বলে !

এই মহিলা এমনিতে ডিমের খোসাগুলি রান্নার পরে জমিয়ে রাখে ও বিক্রী করে খোলা বাজারে । অনেক ধনী নাকি ঐ খোলাগুলি নিয়ে ফাটিয়ে স্ট্রেস কমায় । বলে : আন্ডার ভান্ডা -ফোর ।

বড় বড় খোসাগুলি হাতে নিয়ে ফট্ফট্ করে ফাটাতে ভারি মজা লাগে বৈকি !

কথায় কথায় বললো সুকু যে বর্মায় inle lake আছে । সেখানে জেলেরা বাস করে । জলের মধ্যে- ক্ষুদ্র মাটির ওপরে মানে যেগুলি দ্বীপের মতন মাথা উঁচু করে আছে সেখানে শস্য বপন করে জীবিকা নির্বাহ করে । সেই গাছে আজকাল কীটনাশক দেয় । সেই বিষ ; জলে মিশে যাচ্ছে । মাছেরা মরে যাচ্ছে । জেলেদের ভয় যে জল নষ্ট হলে ওরা খাবে কী ? ওরা যে জলের সন্তান । মৎস্যগন্ধ । মৎস্য-কন্যা ।

ইউ-টিউবে ঐ লেকের ভিডিও দেখলাম । জেলেরা, এক পায়ে বৈঠা বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে । সরু ডিঙি । কেমন অদ্ভুত উপায়ে মাছ ধরছে ওরা । দেখার মতন জিনিস ।

বর্মা একটু অফবিট টুরিস্ট স্পট । যারা অন্য ভ্রমণ পছন্দ করে তাদের আনন্দ দেবে । সেনা শাসন উঠে যাবার পরে টুরিস্টদের আনন্দ দেবার জন্য, এক বর্মি মহিলা এই বিদেশে আসেন এক ট্যুর কোম্পানীর হয়ে । সেই মহিলা সম্প্রতি শকুনিকে বিয়ে করলো ।

নাম তার ঘেন্ট । সুকু আর ঘেন্টের একটি মেয়ে হয়েছে । তার নাম ফুমি । ফুমি এখানে এক রেস্তোরাঁয় কাজ করতো আর পড়তো ।

সেই রেস্তোরাঁ যেই শহরে ,সেখানে আবার গ্রে হাউন্ড ডগের রেস হয় বহুকাল ধরে । এই রেস ওখানে মানুষের ইকোনমিকে সমৃদ্ধ করেছে । বহু টুরিস্ট আসে । বহু দোকানপাট , মেলা বসে ঐ রেসের সময় ।

এখন এই রেস বন্ধ করার কথা ভাবা হচ্ছে । সেই নিয়ে ঐ ছোট শহর এখন মৌনমুখর । অনেকের রুটিরুজির ব্যাপার আছে ।

ফুমির দোকান উঠে যাবে রেস বন্ধ হলে । আর সারমেয়গুলিকেও নাকি মেরে ফেলা হবে । কারণ ওরা সংখ্যায় খুবই বেশি ।

তাই নিয়েও ফুমির একটু দু:খ আছে । কুকুরগুলিকে ও বেশ ভালোবাসে মনে হল । ওর মা বলছে ওকে নিয়ে বর্মায় ফিরে যাবে ।

কিন্তু ফুমি বিদেশে জন্মেছে ও বড় হয়েছে । বর্মি সমাজে মানিয়ে নিতে পারবে কি ? এখানে আবার ইলিশ চালান হয়ে আসে বর্মা থেকে । সেগুলি খেতে মন্দ নয় । সুকু বললো যে ফুমি এরকম কোনো কোম্পানিতে কাজ নিতে পারে যারা ইলিশ চালান করে বর্মা থেকে । তাহলে দুটি দেশই ওর ঘর হবে তখন ।

ইতিমধ্যে আমি একবার ফুমি আর সুকুকে নিয়ে ভাগলপুর , ঘাটশিলা আর বীরভূমের লাভপুরে ঘুরে এসেছি ।

ভাগলপুরে মাংসের চপ খেয়ে ফুমির এখন তখন অবস্থা । ওখানে আবার একটি দেহাতী ছেলে ওর প্রেমে পড়ে যায় । সুকু কিছু বলেনি । দেহাতী তো মানুষ বটেই । হাতি তো নয় ! হাতি দেয়ও না -- দেহাতী । ওরা একেবারে নির্ভেজাল মানুষ । আমাদের মতন হাত-পা চোখফোখ সব আছে ওদের । ওরাও ঈশ্বরের অংশ । ব্রাহমিন্স্ কূলের মতন । একজনকে আঁচড়ে দিয়ে দেখলাম আমার নখদন্ত দিয়ে ; যে লাল রক্তই বার হচ্ছে ! কালো বা নীল নয় !

ঘাটশিলায় একটি ড্যাম দেখতে গেলাম অটো চড়ে । তিনজন বসেছি । অটোওয়ালা বেশি টাকা নিয়ে নিলো ভিনদেশী দেখে । আর স্বয়ং শকুনি তো মোহরের ভান্ডার ! তবে সুকুকে দেখেই চিনতে পেরে গেলো ।

--হা হা হা শাখুনি জী হাপনি কিমন আছেন ? কোথায় কাম-কাজ করছেন ? মিনিস্ট্রি জয়েন করেন নি এখনো ?

ঘাটশিলায় একটি বাংলোতে ছিলাম । সাজানো বাগান । বড় বড় ছায়া ও মায়াময় গাছ । বিশাল ইঁদারা । মানে কুঁয়ো । সেখানে শীতল জল তোলার ব্যবস্থা । দড়ি ধরে মারো টান আর হবে অবাক জলপান !

গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে ঐ শীতল বারি ছিটিয়ে দিলাম সবার গায়ে ।

একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর খনি দেখা হল । যাদুগোড়া নাম । সেখানে নাকি হলুদ পাখি নয় কেক মেলে । সেই কেক খাবার জন্য নয় । শুধু দেখবার জন্য । ইয়েলো কেক । ইয়েলো ফিভারের মতন ।

শালডুংরী নামে একটা জায়গায় বসলাম । বসলাম মধুবনী বনে ।

ময়ূরগড়ে । কামিনী পাতায় । শিশিরে বসেছি । বসেছি চন্দন স্পর্শে ।

ট্রাইবাল মানুষ নগ্ন । বক্ষ, ঊরু ও পিঠ সমস্ত খোলা । জননেন্দ্রিয় গুলি দোদুল্যমান চলন বলনের ঝাপটায় ! আদিমতা প্রতিটি দেহ ভাঁজে !

কিন্তু ওদের যুবকেরা সেগুলি খুবলে খাচ্ছে না । রেপে ঢাকা , ভারতের শহর আজ । তবুও ওরা অসভ্য আর আমরা সভ্য প্রাণী ।

একটি অর্ধনগ্ন আদিবাসী রমণীকে দেখে ফুমি বলে ওঠে : ও এক্সপোজ করছে ! ওকে দিয়ে ইন্ডিয়ার আইটেম সং করানো যায় ।

তু নে মারি এন্ট্রিয়া, দিল মে বাজি ঘন্টিয়া --টং টং টং ---চিক্‌নি চামেলি অথবা সাড়িকে ফল্‌সা কভি ম্যাচ কিয়া রে ?

কারণ শাড়ি তো পরেনা ওরা । ওদের দেহলতা ওপরে ও নিচে দুই জায়গাতেই ডবল ফল্ট ।

সুকু বলে : এভাবে বলো না ! বলো --ওর যোনিতে চাঁদ লেগেছে !

যোনি পূর্ণিমায় ভরা ওর তনুলতা , তাই যোনিতে চাঁদ লেগেছে ।

শকুনি সপরিবারে যেই বাড়িটায় থাকে সেই বাড়িটা বেশ বড় ।

বিশাল ঘরগুলি । কাঁচের জানালা , দেওয়ালে কাঁচ বসানো ।

একটি পুরাতন পিয়ানো আছে যেখানে বসে সুকু ও ফুমি হংসধ্বনি বাজায় । আমার প্রিয় সুরকার, বলিউডের ফাইন মিউজিশিয়ান স্বর্গীয় আদেশ শ্রীবাস্তবজীর সুরে আমি ওদের বাজাতে বলি ।

আজকালকার যুগে- বলিউড ওয়ার্ল্ডে আদেশজীর মতন স্বচ্ছ মানুষ পাওয়া খুবই বিরল ঘটনা । ওঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি ।

ফুমিও সেই সুরধারায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয় ।

লাভপুরেও তো গেলাম ! তারাশংকরের, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা লেখার পটভূমি দেখলাম । দেখলাম নানুরে , চন্ডিদাসের প্রেম নগর ।

যেখানে ধোপানি রামীর সাথে জলকেলি করতেন উনি । পাথরটি এখন ফসিল হয়ে গেছে !

লাভপুরে গ্রামীণ জীবন । ধানক্ষেতের মাঝে জেগে ওঠা । ঘুমিয়ে পড়া । ধানভানা দেখা । ধানের গোলায় লুকোচুরি । সোনালি মাঠ । সবুজ প্রান্তর । সেখানে আলে বসে পাটালি গুড় দিয়ে সুগন্ধী মুড়ি ভক্ষণ !

জিয়ল মাছের ঝোল খেলো সুকু ও ফুমি । আমি সিং, মাগুর আর শোল মাছ খাইনা । মাটির দাওয়াতে বসে মাছের ঝোল আর গরমভাত

খাওয়া এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। চিনির রস দিয়ে রান্না করা দেশী মূর্গি। সমস্ত চেতনায় আদিমতা ছেয়ে যায়। কান্ট্রি লাইফ বলে বিদেশে।

মাটির হাঁড়ির গন্ধ, জিয়ল মাছের লম্ফঝম্প আর নতুন গুড়ের আনাগোনা হৃদয়ে আলোড়ন তোলে।

আমার বর্তমান বাস, ক্যানবেরা শহরে। এখন ক্যানবেরায় বসন্ত লেগেছে। সেদিন ফাগুন মাস। গাছে গাছে নতুন কুঁড়ি।

পর্ণমোচি গাছে নতুন পরশ। পাহাড়ে রং লেগেছে।

ক্যানবেরাতেও মধুবর্ষণ হয়। কুসুম স্পর্শ ঝরে। কিন্তু লাভপুর নিয়ে যায় কৈশোরে। আমার এক পিসির মৃত্যুশোক ভুলতে আমরা সপরিবারে ওখানে যাই আমার বাবার এক কলেজের বন্ধুর বাড়ি। মাটির দোতালা বাড়ি ছিলো ওদের। ভদ্রলোক মনে হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে ঐ গ্রামের কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

নীতিবাগীশ আর কি !

তখন দেখেছিলাম, দুই ধনী ভাইয়ের -সুদৃশ্য দুটি বাড়ি। অট্টালিকা বলা যায়। একটি রঙীন মূর্তি বসানো ; অন্যটা অনেক সাদামাটা কিন্তু সুবিশাল। এক ভাই নাকি অন্যজনকে খুন করেছে। পয়সার জন্য। সালটা ছিলো ১৯৭৮।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর একটি কবিতা আছে **: ভাইকে কোতল করে ভাই, বুকের বন্ধু আমার আততায়ী !**

আমি ঐ কচি বয়সেই সেটা চাক্ষুষ করেছিলাম।

কী করে এত নিকটজন অন্যকে খুন করতে পারে এটা আমার কাছে চিরটাকালই বিস্ময় হয়ে থাকবে । আমি নিজে রিলেশানশিপকে খুব গুরুত্ব দিই । ফ্যামিলি , ট্রাস্ট , কমপ্যাশান , স্যাক্রিফাইস আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপুর্ণ । কাজেই অসম্ভব কোমল মনে এর প্রভাব পড়ে !

শকুনির বিদেশী বাড়িতে বড় বড় কাঁচের দেওয়াল আর জানালার আড়ালে বাগান দেখা যায় । এত অভিজাত বাড়ির বাইরে নাকি খেঁজুড়, তাল আর নারিকেল গাছ !

তালগাছ কটি একেবারে লিভিং রুমের পাশেই । কয়েকটি গাছের পাতা শুকিয়ে গেছে । কেমন গ্রামীণ দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছের মতন , কিছু পাতা শুকনো । বাকিটা সবুজ । ঈষৎ হলুদাভা । কন্ট্রাস্ট লাগে । সাহেবের বাড়িতে তালগাছ হলে যেমন হবে ।

শৈশবে আমি তাল কুড়াতে যেতাম । তাল পড়তো রাতবিরেতে , দুপুরে --ঐ লম্বা গাছ থেকে ঝুপ্ ঝুপ করে । সেই তালের বড়া হত বাড়িতে । মটরশুঁটির ক্ষেত থেকে মটর ছিঁড়ে এনে সবাই খেতো । বন্ধুরা । আমার স্বাদটা ভালোলাগতো না । তবুও দলে পড়ে খেয়ে নিতাম ।

--আমি তো গোবরও কুড়িয়েছি ! শকুনি শুনে অবাক ।

---কলকাতায় বড় হয়ে গোবর কুড়িয়েছো ?

বললাম হেসে -- সত্যি বলছি । গরীব বন্ধুরা ওদের জ্বালানি হিসেবে নিয়ে যেতো । আমিও কুড়িয়েছি । ঘৃণা হত । বাড়িতে খুব বকতো -- তোমাকে কে বলেছে গোবর কুড়াতে ?

পাশেই সাঁওতাল পল্লী ছিলো । আমাদের পাশে যে লোকাল লোকেরা থাকতো, তারা স্থানীয় অধিবাসী । অনেক জমিজমা ছিলো ওদের ।

আমার বাবা ওদের কাছ থেকেই জমি কেনেন । আমরা বাঙাল হলেও জবরদখলের জমিতে থাকিনি । পারিবারিক দুটো বাড়িই কেনা জমিতে । রিফিউজিদের জন্য একটি স্কুল তৈরি করেছিলো আমাদের পরিবার যা আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়ে গেছে । আর শিশুদের স্কুলও আছে । এলাকায় নাম আছে । কাজেই আমরা উদ্বাস্তু হলেও কেনা জমিতে ছিলাম । দখল করিনি ।

ঐ জমিদার পরিবারের এক কর্তা এইসব সাঁওতাল মানুষকে এনে ওখানে পল্লী গড়ে তোলেন । পরে শোনা যায় ওদের পরিবারের এক ছোটকর্ত্তা ওখানে নিয়মিত দেহব্যবসা শুরু করে ।

ভ্রমরকালো , গাঁটাগোট্টা মেয়েরা শরীর দিতো । তাদের মনের হিসেব আর রাখে কে ?

আমি লোকমাধ্যমে শুনে একদিন আমার ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করি - ওঁকে আমি আম্মা বলতাম কাজেই বলি : আম্মা , সবসময় দেখি লোকের বিয়ের পরে একটা গোটা বাচ্চা হয় আর সাঁওতালদের বিয়ের আগেই কেন আস্ত আস্ত সব বাচ্চা হয় ?

আমার অবসার্ভেশান পাওয়ারের স্তুতি না করে বেশ কিছুটা গালি দিলেন : মাইয়াডা এত্তো বাচাল ! যা এখান থেইক্যা !

ভেবেছিলাম যে আমার এই অবসার্ভ করার ব্যাপারটা দেখে উনি আহ্লাদিত হবেন । কিন্তু নাহ্ ! উল্টে বকা খেলাম ।

ভারতের গুরুজনেরা এক একটি হিটলার কেন কে জানে !

ক্লাস থ্রিতে পড়তে সলিড, লিকুইড আর গ্যাসের উদাহরণ হিসেবে বরফ, জল আর ওয়াটার ভেপার লেখাতে মিস্ আমাকে জিরো দিয়ে দেন । আমার পেরেন্টরা মিস্‌কে প্রশ্ন করলে উত্তর পান যে এরকম একই জিনিসের তিনখানা স্টেট দিলে হবেনা । আলাদা দিতে হবে ।

আমার ফিজিসিস্ট বাবা ঐ মিসের ওপরে খাপ্পা ছিলেন ।

প্রশ্নে কিন্তু কোথাও লেখা ছিলো না যে একই জিনিসের তিন স্টেট লেখা যাবেনা । আর আমার মনে হয় এটা বেশ phenomenal--!

ভারতের, ইস্কুলের দিদিমণিরা বদলেছেন কি ?

ড্যানি নামক এক বিদেশী ছেলে তার কৈশোরের বান্ধবীকে বিয়ে করেছে । সেই বান্ধবী ছিলো ওর অন্য এক বন্ধুর গার্লফ্রেন্ড । সেই বন্ধু দুদিনের জ্বরে মারা যায় । এশিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলো ।

তখন থেকে ওর গার্লফ্রেন্ড ড্যানির বান্ধবী আর এখন স্ত্রী ।

ড্যানি বলে যে আমার সামনে অনেক মেয়ে । সবাই গ্ল্যামারাস্ । অ্যাট্রাকটিভ্ । কিন্তু আমি আমার বৌকে নিয়েই থাকতে ইচ্ছুক আর ওকেই ভালোবাসি । হাজারগন্ডা মেয়ের সাথে শোয়া আমার কাপ অফ টি নয় । আসলে ড্যানির মাতামহ নিয়মিত ওর মাকে মোলেস্ট করতেন । মা কিছুটা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন । তখন এক রিফিউজি- যিনি কোনো কমিউনিস্ট দেশ থেকে এসেছিলেন তিনি ড্যানির মাকে বিবাহ করেন । সম্মান দেন । ভদ্রলোক এক বর্ণ ইংলিশ জানতেন না । সাইন ল্যাংগুয়েজে কথা হত । তবুও বিয়ে টিঁকে যায় । সফল সংসার এখন । ড্যানি ব্যাতীত আরো তিনজন আছে । সবাই প্রতিষ্ঠিত ।

জীবনকে সময় দিলে জীবনও হয়ত নতুন সুযোগ দিয়ে থাকে । শুধু ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে । সবুরে মেওয়া ফলে ।

একবার আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটি আজব জন্তু দেখেছি । গোসাপের মতন কিন্তু অনেক অনেক বড় । আস্তে ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে । আমি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলাম । পশুটি বনের অন্যদিকে চলে গেলো । পরে জানলাম যে এগুলি খুবই রেয়ার স্পিসিস আর দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার ।

ঐ জঙ্গলে ঈগলপাখিও দেখেছি । শকুনি বললো যে সে পিরান্হা মাছের রোস্ট খেয়েছে । একটি ঘন বনে এক উপজাতি আছে । তারা ঐ রোস্ট খায় । ওদের পেশা ফিশিং । যারা মাছ ধরতে জানেনা বা পারেনা তাদের বিয়ে হওয়া মুস্কিল হয়ে যায় । কারণ স্ত্রী মাছ খেতে চাইলে কোনো উপায় থাকেনা । অনেক ক্ষেত্রে বৌটি একসাথে দুটি স্বামীকে রাখে । একজন মাছ ধরতে পটু ;অন্যজন সাধারণ মানুষ যে ডাঙায় থাকে । কিছু মানুষ আবার পিরান্হা মাছের ভয়াল দাঁত খুলে নেয় । তাই দিয়ে ফোক্লাদের দাঁত বানায় । বানায় নানান যন্ত্র ।

পিরান্হা রহস্যময় তবে ওরাও আমাদের যমের মতন ভাবে । ওরা নাকি মৃত পশুও খুবলে খায় ।

ক্যানবেরাতে একটি সুদৃশ্য লেক আছে । **Lake Burley Griffin---** সেখানে নানান অপরূপ শোভা দেখা যায় । বিশাল আকৃতি তার । এই শহরে অনেক ডিপ্লোম্যাট বাস করেন । নানান দেশের এম্ব্যাসি আছে । লেকের কাছেই ফ্লাওয়ার শো হয় । বহুলোক হয় সেখানে । নানাবিধ নৌকাবিহার চলে । একটি অপূর্ব বাধ আছে তার নাম হল Scrivener Dam----(not screwdriver)

অপরূপ সব পক্ষী এখানে উড়ে বেড়ায় । জলস্থস্ত ভেঙে এগিয়ে যায় হংসবলাকা । নামে লেক হলেও যেন আমাদের গঙ্গার মতন ।

প্রচুর অ্যাকটিভিটি করা যায় এখানে । বিস্তৃত জলরাশি গুনেই কাটিয়ে দেওয়া যায় অফুরন্ত সময় !

উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটি টাওয়ার । সেখান থেকে পুরো ক্যানবেরা শহর দেখা যায় । মনে হবে ঠিক যেন কালিম্পং এ এসে পড়েছি ।

ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে সার দেওয়া কটেজ । রং বেরং এর পোশাকে নরনারী - পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে । অপূর্ব নগর এই ক্যানবেরা ।

আমার স্বপ্নভূমি । ক্যানবেরাকে ছেড়ে আর কোথাও আমি যাবোনা ।

একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট নিশ্চিত আমি ।

এখানে নর্দান টেরেটরি বলে একটি রাজ্য আছে । সেই রাজ্য আদিবাসী অধ্যুষিত । আমি একবার ওখানে একটি সংস্থায় চাকরি নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম । ওরা জানতে চায় যে কেন আমি আদিবাসীদের মধ্যে যেতে চাই । আমি বলি যে আমার বাবা ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ লোধাদের মধ্যে কাজ করেছেন তাই ।

পরে অবশ্য যাওয়া হয়নি । কারণ আমি সিলেকটেড্ হইনি ।

শারীরিক দক্ষতায় পিছিয়ে পড়েছি । আমার এক বন্ধু গেছে । ও ভারত থেকে এসেছে । ওর বাবা একজন নামী গাইয়ে । ওর মায়ের অবৈধ সন্তান সে । বাবা ওকে স্বীকৃতি দেয়নি । তাই বাবার ওপরে

ভীষণ ক্ষোভ তার । মা ওর বাবার বাড়ির আয়া ছিলো । বাবা ওর মায়ের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ।

--সেক্স করতে কার না ভালোলাগে ? তাই বলে মাকে স্বীকৃতি দেবে না ? নিজের বাচ্চাকে ফেলে দেবে ?

মেয়েটি এখন আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে । ওদের সুখ দু:খের সাথী । ঝড় জলে পর্যন্ত ওদের মধ্যে গিয়ে খাবার বিলায় । ওষুধ দেয় । এই তো জীবন এখন !

এখানে এক সাদা চামড়াকে বিয়ে করেছিলো । সে ইলেক্ট্রিসিয়ান ।

দুই বছর সবকিছু ভালো ছিলো । শেষে একদিন লোকটি নিজের হাতের রগ কেটে আত্মহত্যা করে বসে । তবে কাউকে দায়ী করে যায়না । লিখে যায় যে একাকীত্ব তার অসহ্য হয়ে উঠেছিলো । আসলে মেয়েটি তখন ঐ আদিবাসীদের মাঝে কাজ করছে ।

লোকটি হয়ত ওখানে যাবে না । কাজেই ফুরিয়ে গেলো তার জীবনের মোমদানি । মেয়েটি আর বিয়ে করেনি ।

লোকটির এক পঙ্গু ভাই ছিলো । ওর কাছেই থাকতো । সে এখন নাকি এক মাফিয়ার বাড়ি থাকে । কাজ করে । ওর মদের দোকানে হিসেব লেখে । মাফিয়া, একেবারে নিপাট ভালোমানুষ ও ভদ্রলোক । কোনো সি-ই-ওর থেকে কম এটিকেট জানে এরকম নয় । অত্যন্ত ভদ্র ।

আর দানশীল । মানুষকে বলে : আমি তোমাদের কাছে মন্দ হলেও দুনিয়ার সবার কাছে মন্দ নই । যারা আমার কাছে আশ্রিত আমি তাদের কাছ গড !

এখন একটি সদ্য ফোঁটা ফুলকে নিয়ে থাকে । মেয়েটি অপরূপা । মাফিয়ার সঙ্গিনী । সে নিজে পেদোফাইলদের সাহায্যের জন্য একটি এন জি ও চালায় । পেদোফাইলরা সমাজে ঘৃণিত । ওদের কেউ বাসা ভাড়া দেয়না । কোথাও কাজ দেয়না ইত্যাদি । কোনো কমিউনিটিতে যেতে পারেনা ওরা । এখন ঐ নির্মল ফুল নিজে সংস্থা খুলে পেদোফাইলদের সাহায্য করে । তবে এইসব মানুষেরা সবাই জেল থেকে শাস্তি শেষ করে বার হয়েছে । আইনতঃ ওরা এখন মুক্ত ।

নীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ । তবুও শিকলের আঘাত থেকেই যায় ।

সেখানে চন্দন প্রলেপ দেয় মাফিয়া প্রিয়া তেনালি । তেনালি ব্রাউন জিটি । সংস্থার নাম ফাঙ্গাস । পেদোফাইলের বাসাগুলি ফাঙ্গাসে মোড়া । ছাতা চারিদিকে । এখন তেনালি ওখানে বিশুদ্ধ বাতাস স্প্রে করে ।

অনেকের শুভ হয় । সমাজ একটু হাত বাড়ালে ওরা নিজেদের ভুল শুধরাতে পারে । একজন বলছিলো যে এখানে কচি কচি মেয়েরা এমন খোলামেলা পোশাক পরে যে নিজেকে সামলাতে পারেনি । তবে বোঝে যে যা করেছে তা ভালো কাজ নয় । আর এখন বদলাতে চায় ।

তেনালি নিজে, এক প্রফেসরের মেয়ে । সৎমা আর বাবাকে ছেড়েছে । ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়েছে । ডাইনামিক , র‍্যাশেনাল আর কাইন্ড ।

মাফিয়ায় খপ্‌পরে কী উপায়ে পড়লো কেউ জানেনা ।

তবে যেই কাজ করছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । হাফ ব্রাদার আর সিস্টার নাকি ওকে খুব উৎসাহ দেয় । ওদের সাথে যোগাযোগ আছে । নিয়মিত বার্বিকিউ করে ওদের সাথে ।

আমি একবার এখানে একটি প্রিজন দেখতে যাই । আমাকে ঢুকতে দেয়নি । কারণ কোনো কয়েদী আমার নিকটজন নয় ।

অন্য একটি জেলের এক প্রিস্ট, যিনি নিজে লেসবিয়ান উনি সম্পর্কে আমার এক আত্মীয় হন । উনি একবার আমাকে বলেছিলেন যে কয়েদীরা মানুষ চায় । মানুষদের দেখতে চায় । কিন্তু তুমি কেন ওদের কাছে যেতে চাও ?

আমি যে কয়েদী দেখিনি তা নয় । শৈশবে আমাদের পাড়ায় এক জেল পালানো কয়েদী এসেছিলো । পায়ে লোহার বেড়ি পরা । সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে দেয় । আমি কেবল বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে ছিলাম ।

আরেক রিলেশান আছেন- উনি, কয়েদীদের যখন অন্য স্টেটে ট্রান্সফার করা হয় তখন যেই গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় সেই গাড়ির সমস্ত সিকিউরিটি অর্থাৎ তালা চাবি তৈরি করেন ।

মাফিয়ার অপরাধের ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। এখানে ফার্ট লাইটিং (**pyroflatulence** or **flatus ignition**)হয়।

অস্ট্রেলিয়াতে ওকে **ব্লু-ফ্লেম** বলে। কারণ মূলত এর রং নীল।

অন্য রং এর বায়ুও সম্ভব ; আসলে সবই নির্ভর করে কোলনের মধ্যে সৃষ্ট গ্যাসের ওপরে।এখানে ছেলেপুলেরা মজা করে এসব করে থাকে। এই মাফিয়া ; যুবক বয়সে একবার পিকনিকে গিয়ে একদল বিদেশীকে জোর করে ধরে নিয়ে ওদেরকে ফার্ট হতে পারে এমন সমস্ত খাবার খাইয়ে অ্যানাল ফিউম পরীক্ষা করতে থাকে। যদি কারো লাল রং ধরা পড়ে তবে সে নাকি কমিউনিস্ট আর তাকে উত্তম মধ্যম দেওয়া হবে।

এইভাবেই কারো লালাভ বায়ু বা অ্যানাল ফিউম তাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়। মারের চোটে মানুষটি মারা যায়। আসলে মাফিয়ার পূর্বজ ; একটি কমিউনিস্ট দেশ থেকে পালিয়ে আসে দারিদ্র্যের জন্য। পরে আমেরিকাতে যায়। দেখে যে কমিউনিস্টরা আমেরিকা সম্পর্কে যা বলে তা অসত্য। ওদের এলাকার এক সম্মানীয় ব্যাক্তি ওদের ঘরের মালপত্র টেনে তুলছিলো দোতলায়। অথচ মানুষটি একেবারে সাধারণ। কোনো ইগো নেই। কিন্তু কমিউনিস্টরা-ধনীদের সম্পর্কে সবসময় ভুল ধারণা প্রচার করে। তাই এই মাফিয়া কমিউনিস্টদের ওপরে বেজায় খাপ্পা হয়ে ওঠে , দেখলেই মার দিতো।

ফার্ট জ্বালিয়ে যখন লাল শিখা দেখলো তখন ওকে কমিউনিস্ট ভেবে মারতে শুরু করে।

ইউ কমিউনিস্ট বাস্টার্ড , ইউ চিট্, লায়ার , সন অফ আ বিচ্ !

খুনের দায়ে কঠোর শাস্তি হয় । তারপর থেকে মাফিয়া গ্রুপ জয়েন করে । একটা সময় শীতে রেল স্টেশানে থাকতো । পরে পয়সা করে অট্টালিকা বানায় ।

মাফিয়ার প্রিয় খাদ্য নাকি হাঁসের বিরিয়ানি । বিরিয়ানি রাজা গজাদের

খানা । কাজেই কোনো ভিখারী, ভিক্ষাপাত্র হাতে নেওয়া কমিউনিস্ট এটা রান্না করতে পারবে না এই ব্যাপারে মাফিয়া নিশ্চিত । তাই এটা ওর সবচেয়ে প্রিয় খাবার ।

শকুনি আর আমি সিডনি গেলাম । আগেও গিয়েছি । ক্যানবেরা থেকে সিডনি যাবার পথ মধুময় । পাহাড় , জঙ্গল আর নদী । এই তিন- সদা সঙ্গী । আমার এক বন্ধু এর মাঝে থাকে । ও মণিপুর থেকে এসেছে । সেলুলার বায়লজিস্ট । নানান যন্ত্র ব্যবহার করে ওরা মানুষের কোষের মধ্যে , টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করে । ভার্চুয়াল রিয়ালিটি । ঢুকে যায় যেন দেহের মধ্যে । ক্যামেরার সাহায্যে ।

ওর কাছেই আমি লংপি পটারির কথা শুনেছি যা আমি একটি গল্পে মেলে ধরেছি । লোমি নাম দিয়ে । তারপর অনেকদূর থেকে (সমুদ্রে) লেকে নুন আনতে যেতো মানুষ সেটাও ওর কাছে শুনেছি । পাঠকের জন্য নিচের লিঙ্ক ।

https://en.wikipedia.org/wiki/Longpi

এখানে একটি লেক আছে যাকে লোক বলে ম্যাজিক লেক । নাম লেক জর্জ । সেখানে হঠাৎ হঠাৎ জল আসে আবার একদিন হঠাৎ লেকটি নিজে থেকে শুকিয়ে মাঠ হয়ে যায় ।

আমার খুব দেখার ইচ্ছে এমন আজব লেক । সুকু আর আমি সেদিন সিডনি চলেছি । প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা লাগে ক্যানবেরা থেকে ।

একটি জায়গায় দেখি ধূ ধূ মাঠ । দূরে কিছু উইন্ডমিল ঘুরছে ।

ওকে বলে উঠি : দেখো কেমন ধূ ধূ প্রান্তর !

ও জিপিএস দেখিয়ে বলে ওঠে : এটাই তোমার লেক জর্জ হে কন্যে !

চমকে উঠে । ভাবি ঠাট্টা করছে । কিন্তু জিপিএস সত্যিই বলছে যে এটাই লেক জর্জ এবং এখানে এখন জল নেই । খরা ।

রহস্যজনক ব্যাপার তাই না ?

ঘটনাটি সত্য । শকুনি মিথ কিন্তু লেক জর্জ ও আমার এমন করে তার স্পর্শ পাওয়া নির্ভেজাল সত্য ।

ফটোশপড্ ইমেজ নয় , রিয়ল ফটো একদম ।

সিডনিকে তিমি মাছের জায়গা বলা হয় । হোয়েল ক্যাপিটাল । বহু তিমিমাছ , সমুদ্র কেটে সিডনি হয়ে অন্যত্র যায় ।

এখানে মাদাম তুঁসোর মিউজিয়াম আছে যেখানে মোমের মানুষ বিদ্যমান । সিডনি ফিশ মার্কেট দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বাপেক্ষা বড় মৎস্য বাজার । এখানকার স্যমন মাছের স্বাদ অসাধারণ ।

মৎস্য ভান্ডার দেখাই এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা । আঁশটে গন্ধ সহ্য করতে পারলে , মন্দ নয় । ভেটকি, তেলাপিয়া , সার্ডিন সবই পেতে পারেন । আমি ফ্রিটাটা বানিয়ে খেলাম জলছবির পাড়ে ।

ব্রিসবেনেও গিয়েছিলাম । ওখানে আনারসের নানান খাবার মেলে । স্যান্ডউইচে আনারস দেয় ওরা । মন্দ লাগেনা । তবে খুব বৃষ্টি হয় ওখানে আর প্রায়ই বন্যা হয় । সিডনির চেয়ে অনেক ছোট শহর ।

কুইন্সল্যান্ড রাজ্য অর্থাৎ যেখানে ব্রিসবেন , সেই রাজ্যটি খুবই সবুজ আর মনোমুগ্ধকর । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে অনেক এগিয়ে ।Great Barrier Reef, গোল্ড কোস্ট , সানশাইন কোস্ট এইসব বিচ এখানেই আছে । **কোরাল রিফের গ্রেট বি রিফ** দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ যান । এছাড়া আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর আছে কুইন্সল্যান্ডে । অরণ্য আছে । কেবল ঐ বৃষ্টি আর বন্যাটা !!

আমরা একটি গাড়ি ভাড়া করে নিজেরা চালিয়ে ঘুরতাম, গোল্ড কোস্টের দিকেও গিয়েছিলাম ।

অনেক বিখ্যাত মানুষ আছেন এখানে । একজন হলেন :

Peter C. Doherty, medical researcher and Nobel Prize winner-

Wiki Info---**Peter Charles Doherty** (born 15 October 1940) is an Australian veterinary surgeon and researcher in the field of medicine. He received the Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly with Rolf M. Zinkernagel in 1996 ---

একটি ভূটিয়া ছেলের সাথে আলাপ হয়েছিলো ব্রিসবেনে। স্পেশাল ভিসায় এসেছে। কাজ করে খাবার কী অদম্য ইচ্ছে ওর !

পার্থ থেকে এসেছে ব্রিসবেনে ; কাজ করতে এক স্কুলে। পড়ায় না ওখানে , সাফসুতরো করে।

বলে : ভূটানের চেয়ে এখানে ভালো আছি। ওখানে অনেক কষ্ট। এখানে প্রিয়জনেরা নেই এই যা। নাহলে লাইফ খুব মসৃণ এখানে।

ওকে সবাই জিকা বলে সম্বোধন করছিলো।

জিকা আমাকে বললো : আমরা এখন কান্ট্রি মেট। আগে নেবার ছিলাম। তাই না ?

আমি মধুচন্দ্রিমা করতে ভূটানের দিকে যেতাম। কিন্তু পাসপোর্ট না নিয়ে যাওয়ায় প্লেনে উঠতে দেয়নি। এক অফিসার এসে খুবই দু:খ করে বলেন : আপনারা হনিমুনে যাচ্ছেন আমার আটকানো অনুচিত কিন্তু পাসপোর্ট না নিয়ে গেলে ওখানে ঢুকতে দেবেনা। আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে !

কাজেই আমরা ফিরে আসি। আসলে ভেবেছিলাম নেপাল, ভূটানে কি আর পাসপোর্ট লাগবে ?

জিকা সব শুনে সরি বললো। তারপরে বললো : এবার গেলে আমার বাসায় নিশ্চয়ই যাবে। নেমতন্ন করে গেলাম।

Albury ,Wodonga ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছি । তাঁবুতে ছিলাম । এগুলি আগে আদিবাসীদের জায়গা ছিলো । আমি যে নানান লেখায় ওদের কথা লিখি সেগুলি সব এইসব জায়গা ঘুরে, দেখে শিখে লেখা । অনেক মিউজিয়াম দেখেছি ওদের । ওদের জীবনধারা , আর্ট আর চিকিৎসা নিয়ে অনেক কথা শুনেছি ।

তাঁবুতে ; আমরা একটি মাটির পাত্রে কয়েকটি তেজপাতা জ্বালিয়ে ছিলাম । এতে এনার্জি শুদ্ধ হয় । সুগন্ধও ভাসে বাতাসে । তাঁবুর মধ্যে পাতা নিচু খাট । তাতে বড় বড় মখমলি বালিশ । তেজপাতা সুবাস আর অ্যাব-অরিজিন্যাল মানুষের গল্পকথা এই নিয়ে কেটে গেলো দিন ।

কাছেই একটি সাবমেরিন মিউজিয়াম আছে । সেই সাবমেরিনটির ভেতর- কাফে আছে । আমরা খুব এনজয় করলাম । গোটা একটি সাবমেরিনে ঢোকা, আগে হয়নি । কোথায় নাবিক বসে , কোথায় পেরিস্কোপ থাকে সবই দেখলাম ।

এই যমজ শহর দুটির কাছে আছে ওয়াইনের ক্ষেত , পাহাড়ি আভা , মারে নদী । আমরা পড়েছি কিনা ভূগোলে যে অস্ট্রেলিয়াতে মারে-ডার্লিং নদী আছে ? সেই মারে নদী এখানে বয়ে চলেছে ।

তবে আমরা খ্রীস্টমাসের সময় গেছি বলে সব বন্ধ ছিলো ।

একটি গ্রসারি স্টোর কেবল খোলা ছিলো । আমি আর আমার পতিদেব, শুনশান পথে রোমান্টিক ওয়াকে গেলাম । শকুনি সৎ

পরামর্শ দিলো । বললো : তোমরা ওয়াকে যাও, আমি খাবারের সন্ধানে যাই ।

গ্রসারি স্টোরে কিছু স্যান্ডউইচ আর হটডগ ছিলো । অল্প বিফ কাবাব । সেগুলিই খুব খাওয়া হল ।

পরে তাঁবুতে বসে মারে নদীর উপকথা আর ডার্লিং নদীর অনুপস্থিতি এই নিয়েই চলছিলো আলোচনা । **রাতভর ইলিশ** না হলেও বালিশে মাথা দিয়ে কেটে গেলো জোছনা আবেশ ।

অস্ট্রেলিয়াতে মোটামুটি ছোট ছোট জনপদগুলি একইরকম ।

প্ল্যানড্ সবকিছু । সুন্দর । সুললিত । কিছু পথভোলা ক্যাঙারুর পাল । আর অজস্র , রঙীন মুক্ত বিহঙ্গ । নীল আকাশ । স্বচ্ছ আকাশ বাতাস । এতবড় চাঁদ আমি দেশে থাকতে দেখিনি !

মনে হয় যেন গোটা চাঁদটা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়বে আমার ঘরে । অসংখ্য তারা দেখা যায় । তারাগুলি উজ্জ্বল । কোনো কোনো তারা হয়ত খসে পড়ে আমার বাগানে । আমি ওদের তুলে এনে ফ্রিজে রেখে দিই । এত গরম লাগছে ওদের কতবর্ষ হয়ে গেলো । এবার একটু শীতল হোক্ !

শকুনিকে প্রশ্ন করি গান্ধারীর ১০০ সন্তান নিয়ে । সুকু হেসে ওঠে । তারপর বলে : **এগুলো তোমাদের এখনকার সায়েন্সের স্টাইলে হয়েছে । যেমন-triplets কিংবা আরো বেশি সংখ্যক শিশুর জন্ম হয় সেরকমই গান্ধুরও ওরকম হয়েছিলো । হ্যাঁ, আমি আদর করে বোনকে গান্ধু বলতাম ।কখনও বলতাম সুগন্ধা । গন্ধী কিংবা গিণি !**

ইতিমধ্যে আমরা একটি চওড়া সুন্দর রাস্তায় উঠেছি । ক্যানবেরার

কাছেই Bungendore--- এই পথ । দুদিকে পাহাড়ের সারি । আর পথপাশে বড় বড় গাছ । তাতে অনেক পুতুল ঝোলালো । বার্বি ডল বা সাধারণ কোনো পুতুল । পর পর গাছগুলি পুতুলে ভর্তি । এই পুতুলগুলি রহস্যময় । কেউ বলে এলাকার কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান এগুলি ঝুলিয়ে রেখেছে । কেউ বলে কোনো বাচ্চার বাবা ও মা তাদের ফেলে দেওয়া ডল গাছে ঝুলিয়েছে আবার কোনো ডল তৈরি করা কোম্পানি বলে যে লোকেদের এইসব পুতুল আকর্ষণ করে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তারা এটা করেছে । কিন্তু পুতুল কীর্তন রহস্যাবৃত ।

আমার শিশুদের জন্য রচিত ভূতের বই ডলপুতুলে আমি ঐ পুতুলদের কথাই লিখেছিলাম ।

শুনেছি , কোনো এক দ্বীপে নাকি সত্যি ওরকম ভৌতিক সমস্ত পুতুল ঝোলানো আছে, সারা অরণ্য জুড়ে ------**Mexico's haunted 'Island of the Dolls'**

কোথায় নাকি একটি পুতুল আছে- তার বয়স বাড়ে , চামড়া কুঁচকে যায় । লোলচর্ম হয়ে যায় ক্রমশ এই পুতুল ।

এটা সত্যি নাকি গল্প জানিনা তবে আন্তর্জালে এই বিষয়ে পাওয়া যাবে খুঁজলে ।

আগে যখন আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন আমি ব্যালারাট নামে একটি ছোট শহরে ছিলাম । প্রাক্তন খনি শহর এবং অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভৌতিক শহর ।

নিয়মিত ঘোস্ট ট্যুর হয় । ওখানে আমি মাস ছয়েক ছিলাম ।

আমার মা ব্যালারাট হসপিটালেই মারা গেছেন । মায়ের হাসপাতালের বেড থেকে পাহাড়ের ঢালু খাদ ও সন্ধ্যায় আলোর মালা দেখা যেতো ।

আমার মাকে আমরা কোনদিন শুয়ে থাকতে দেখিনি । খুবই কর্মঠ ছিলো মা । আর শেষ শয্যায় শুয়ে মা বলতো : দেখ্ , আমার মৃত্যু বিদেশেই হবে কেউ কী জানতো ?

ক্যান্সারের কোনো চিকিৎসা নেয়নি । শান্তিতে চলে গেছে ।

মায়ের গুরুদেব (Swami Sivananda) এখনও জীবিত । ১০০ বছরের ওপরে বয়স ওঁর । বেনারসে থাকেন । সম্প্রতি টাইমস্ অফ

ইন্ডিয়াতে ওঁকে নিয়ে আর্টিকেল বার হয়েছে । সম্ভবত: উনি সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ বলেই ।

ব্যালারাটের কাছেই ক্রেসউইক কান্ট্রি । আমার ভাতৃবধূরা আমাকে ড্রাইভ করে ওদিকে প্রায়ই নিয়ে যেতো । একজন মেয়ে অস্ট্রেলিয়ান অন্যজন বাঙালী । মেমবধূর এক বান্ধবী ওখানে আছে । তার বাড়ি গিয়েছি । ছোট অরণ্যে ঘেরা গ্রাম ক্রেসউইক । আমার **থেল্‌মা** গল্প ঐ ক্রেসউইক গ্রামের ওপরে ভিত্তি করে লেখা ।

এত সুন্দর ক্রেসউইক যে আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেতাম ।

এই এলাকার অনতিদূরে ডেলস্‌ফোর্ড । ওখানে আমি বহুবার গিয়েছি । এটা সমকামীদের নগর আর স্পা ক্যাপিটাল বলা হয় একে । মেলবোর্নের মানুষ উইক-এন্ড কাটাতে এখানে আসে ।

যেমন মুম্বাইয়ের মানুষ যায় পঞ্চগণি , লোনাভালা সেইরকম ।

একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁতে নিয়মিত যেতাম । সিঙারা , ফিশ অমৃতসারি এসব চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে মুগ্ধ হতাম ।

একটি বিশেষ জায়গায় পেপারমিন্ট-টি পেতাম । **কমলালেবু রংয়ের গাড়ি** গল্পটা ঐ মুগ্ধতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ।

এখানে একটি বড় লেক আছে । খুবই আকর্ষক । সেখানে বসে দেখি অনেকে কবিতা লিখছে । কেউবা গীটার বাজাচ্ছে ।

ডেল্‌সফোর্ড খুব সুন্দর জায়গা । আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওখানে । বিদেশবাস--টাই খুব আনন্দদায়ক ।

মসৃণ জীবন , মনোরম পথঘাট , বিল্ডিং । মানুষজন ভদ্রসভ্য ।

আরো দূরে আছে Maldon--- পুরাতন ইংলিশ (ভিক্টোরিয়ান) শহর একটি । এখানে পুরনো ধাঁচের চকোলেট পাওয়া যায় ।

(Internet Info)----History buffs you, appreciate one of Australia's most intact streetscapes – in 2016 Maldon celebrates its 50th anniversary of being recognised by National Trust as "Australia's First Notable Town". They also wouldn't miss a ride on the steam train, a visit to the museums or a tour of a gold mine---

আমাদের সারথি বলে যে এদিকে নানান ঝর্ণা আছে । সেইসব পাহাড়িয়া জল কালেক্ট করে মানুষ পান করে । অবাক জলপান ।

এতে নাকি আগ্নেয়গিরির বহু উপকারি খনিজ বস্তু থাকে ।

তবে এই তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা । একটি পাহাড় আছে সেখানে নাকি এরকম জল মেলে । নাম Mount Franklin (extinct volcano)---

হয়ত এগুলি লোকগাথা । মিথ্ । রহস্যে ঘেরা পাহাড়ি কুয়াশা ।

ব্যালারাটে থাকাকালীন আমি বনে যেতাম ঘুরতে । ওখানে ঘন বনের মাঝে ,একটি পরিত্যক্ত কাঠের বাড়িতে আমার এক পরিচিত বিয়ে করে । ওদের পয়সা না থাকায় ওরা একটি সাধারণ রূপার পাতকে কেটে নিয়ে দুটি আংটি বানিয়ে বিয়ের সময় আংটি বদল করে ।

আমার কিন্তু বনের মধ্যে বিয়েটা মন্দ লাগেনি । বিয়ের শেষে আমরা সবাই অরণ্যে মাংস পুড়িয়ে খেলাম । অবসরে দেখলাম ব্যালারাট মিউজিয়াম । ওটাও বিয়ের মধ্যেই পড়ে । অতিথি সেবার অঙ্গ ।

সবাইকে নিয়ে পাত্রপাত্রী গেলো মিউজিয়ামে । সেখানে আবার একটি সরু পথে সবাই খুব নাচলো । এই পাত্রের বাবা- ভারতের একটি শহরে ভাং বিক্রি করে । ছেলেটি এখানে মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আসে । কিন্তু ফেল করতে শুরু করে- আর ইংলিশেও খুব কাঁচা । শেষপর্যন্ত এক লোকাল মেয়ের প্রেমে পড়ে ওরই পরামর্শে কোর্স করে চাকরি নেয় । আয় সামান্য হয় । নতুন চাকরি বলে ।

মেয়েটি ইতিমধ্যে অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ায় বিয়ে করে দুজনে ।

মেয়েটি হিউমান রাইটস্ নিয়ে পড়াশোনা করতো ।

ওদের বনবাসরের বিয়েটা আমি খুবই এনজয় করেছি ।

ডেলস্ফোর্ডে আবার সমকামীরা অনেক দোকান বাজার হোটেল চালায় । ওরাই ওখানে বেশি থাকে । আমি এক কাপেলের সাথে আলাপ করি । ধরা যাক ওদের নাম ন্যাট আর শিউলি ।

শিউলি ভারতীয় মেয়ে আর ন্যাট ফিলিপিনো । শিউলির নাকি কৈশোর থেকেই নারীদেহ ভালোলাগতো । মেয়েদের দেখলেই ও শিহরিত হত । এখানে ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনারের কাজ করতো । বাগিচা এখানে আছে অনেক, যেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো যায় । অপরূপ সব বাগান ; যেখানে গ্রাম্য পরিবেশে কিছু কটেজ-- যেগুলি আদতে টুরিস্টদের বিনোদনের

জায়গা , সেসব বাগানের প্ল্যানিং ও মেন্টেনেন্স করার সব কাজ করতো । দেশে শিউলি- সিভিলে ডিপ্লোমা করেছিলো । প্রথমে সাধারণ বাগিচায় কাজ নিলেও পরে একটি হন্টেড্ হোম-স্টে যেখানে খুব ভৌতিক কার্যকলাপ হয় এবং গেস্টরা প্রায় প্রত্যেকেই ওখানে ভূতের দেখা পেয়ে থাকেন সেই বাড়ির বাগান পরিচর্যার কাজ নিয়েছিলো । ন্যাট ওখানে গেস্ট হয়েই আসে । দুজনের আলাপ হয় ও পরে রিলেশানশিপে যায় ।

ন্যাট আবার একটু পুরুষালি আর শিউলি হল শিউলি ফুলের মতনই কোমল । ন্যাটের ঠাকুমা আর দাদু যাদের কাছে ন্যাট মানুষ হয়েছে তারা খুব জুয়া খেলতো । ন্যাটের মায়ের বছর বছর সন্তান হত ।

কাজেই একটি দুটিকে এদিক ওদিক পাঠিয়ে দিতো ।

ন্যাটের দাদুর জুয়া খেলার বহর দেখে ওর বাবা একপ্রকার বিরক্ত হয়েই ওকে নিয়ে যায় আর হোস্টেলে ভর্তি করে দেয় । এরপরে আর ন্যাট কোনোদিনও বাড়ি ফিরতে পারেনি ।

ওর ঠাকুমা নাকি জুয়াতে জেতা টাকাপয়সা ওদের বাড়ির বাঁশের পিলারে লুকিয়ে রাখতো । সেই পিলার তো ফাঁকা । কোনোভাবে পিলার কেটে পয়সাগুলি রেখে দিতো ।

ভদ্রমহিলার মৃত্যুর পর ঐ পিলারগুলিতে রাতবিরেতে কাঁপুনি ও প্রচন্ড শব্দ হত যেন ভূকম্পনে দুলছে গোটা বাড়ি ! পরে একটি পিলার বুঝি ভেঙে পড়ে এবং দেখা যায় যে তাতে অনেক টাকা জমানো । সেই থেকে ন্যাটের ভূতে বিশ্বাস হয় তাই ঐ ভূতের বাড়িতে গেস্ট হিসেবে যায় । এখানেই শিউলি মানে নিজ জীবনসাথীর সন্ধান পায় ।

শিউলি ও ন্যাটের কোনো সন্তান তো নেই কিন্তু অনেক কুকুর ও বিড়াল আছে । একটা পোষা গিরগিটি আছে । ওরা অনেক পশুপাখীদের সংস্থায় ডোনেট করে । নিজেদের পোষ্যরা ওদের বাচ্চার মতন । ওদের ভাষা বোঝে তারা । খেতে পরতে পায় বলেই শুধু নয় এক অদ্ভুত টানে ওরা ধাবিত হয় শিউলি আর ন্যাটের দিকে । ওদের চোখে আদরের আকুতি , শিউলিদের চোখে অপত্য স্নেহের স্পর্শ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই !

এই যে এগুলি লিখছি আমি-- যেন ওদের ছুঁতে পারছি সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ।

শকুনি বললো যে রাজস্থানে ও আরাবল্লী পেরিয়ে গিয়েছিলো মাউন্ট আবুতে । আবু পাহাড়ে শিল্পের ছন্দ !

দিলওয়ারা মন্দির দেখলে মনে হবে কোনো পেপার কাটিং দেখছি । শ্বেতপাথরে যে এরকম সুক্ষ্ম কাজ করা যায় তা ভাবনার বাইরে । আরাবল্লী পেরোবার আগে ডাকাতের ভয়ে খুব ভোরে রওনা হয় । প্রায় রাত থাকতে থাকতেই যাত্রা শুরু হয়ে ।

কোহরা সিনেমার---ঝুম ঝুম ঢলতি রাত , লেকে চলে মুঝে আপনে সাথ ----গান শুনতে শুনতে ডুবে যায় যাত্রাপথে ।

পুরাতন লিরিক্স আর আজকের হিন্দী গানের লিরিক্স পাশাপাশি রাখলে একটু অবাক লাগে । আমরা কি এগোচ্ছি ? আগে ভ্যাম্প-রা চটুল নাচগুলো করতো । এখন হিরোইনরাও এসব করে ।

চিক্‌নি চামেলি , গন্ধী বাত্‌ এগুলো আগে খলনায়িকারা করতো ।

আসলে যুগের হাওয়া । সমাজের প্রতিফলনই তো সিনেমা ! লোকে বলে ইউ-পি, বিহারের দর্শকদের জন্য এসব তৈরি করা হয় ।

দিলওয়ারা মন্দিরের মতন অন্য মন্দিরও তৈরি হয়েছিলো । রণকপুরের মন্দির । সেখানে বসে খুব পাকোড়া আর মিষ্টি খেলো । সুকুর ভালোলেগেছে । মন্দিরটা খুব ঠান্ডা । একটা স্নিগ্ধ ছায়াময় পরিবেশ আছে । আর ইতিহাস তো জীবন্ত বটেই । শকুনি শান্তি পেয়েছে ওখানে ।

রাজস্থান এক রহস্যময় রাজ্য । রাণা , উট আর মরুভূমির মধ্যে কখনো বা জেগে ওঠে সবুজ সবুজ দ্বীপ । রণকপুর এরকমই এক উপলব্ধি । কেবল অস্তিত্ব নয় একটি সুক্ষ্ম চেতনা যাকে আঁকড়ে ধরলে রাজস্থানের সুবাস পাওয়া যাবে ওর হিল্লোলে । হিল্লোল, কল্লোল, হরষ আর বিষাদ ।

ঘুঙুরের আওয়াজ , ঘোড়ার খূড়ের শব্দ আর রাজপুতানি মেয়ের হাসি । রাজস্থান , মারোয়ার , বালিঝড় , উদ্দাম জীবন ।

এও তো আরেক বাঁচা । পাশা খেলার মতন স্বতন্ত্র । অন্য ভুবনের রসসিক্ত । দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ; তাকে নিজ জঙ্ঘায় বসানোর আহ্বান যতই কটু মনে হোক্ এও আরেক বাঁচা । হয়ত দর্পণের মধ্যে বাঁচা !

মানুষের মন সবসময় ডুয়াল অ্যাস্পেক্ট, দ্বৈত সত্ত্বায় নিমজ্জিত হতে চায় । পাপ-পুণ্য, ঘৃণা-প্রেম, আলো-ছায়া, বাঁচা-মরা, উষ্ণ-আর্দ্র এইরকম । দুটৈ কিন্তু এই জগতেই আছে । কাজেই বস্ত্রহরণ যেমন সত্য মরুঝড়ও আরেক জীবন । হিউমান কনশাসনেসের এই দ্বৈত সত্ত্বাই জন্ম দেয় এক একটি রাজস্থান অথবা কুরুবংশের ।

বেলুড় হালেবিড়ে ঘুরেও একই অনুভূতি হয় সুকুর ।

পুরাতন দুই মন্দির । প্রতিটি খাঁজে অজস্র মাইথোলজি ।

আবছা মৈথুন , মুর্চ্ছণা, মধুমন্দ্রিত , মদিরাসিক্ত কারুকার্য সব ।

মন্দির দুটি যেন কথা বলছে । শকুনির কাছে তা ইতিহাস নয় । ভবিষ্যৎ । তবুও আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে নিচ্ছে নিজেকে, মহাভারতের অপোগন্ড , ঘৃণিত -আজ লাজনম্র শকুনি ।

শকুনিও বদলে গেছে। মন্দির গাত্রে মহাভারতের গল্প আঁকা । তাই বুঝি বললো : আমি কারুকার্জ করলে আরো সুন্দর করে করতে পারতাম ।

শকুনির নামে একটি মন্দির আছে কেরালায় । সেখানে নিয়মিত মানুষ অর্চনা করে থাকে । মন্দিরটি নাকি শৈল্পিক দিক থেকে অপূর্ব । (Malanada Shakuni Temple)

গল্পকথা অনুসারে শকুনি ; মোক্ষ পেয়ে লর্ড শকুনি হয়েছিলো এখানেই । তথ্যটি সত্য কিনা জানতে চাইলে শকুনি বলে ওঠে : মোক্ষ না হলে আমি ইটার্নাল ব্লিসে আছি কী করে ? আর আমি তো জীবন্ত , দেখছো না ? তোমাকে রক্ষা করার জন্য তোমার সারথী হয়েছি !

শকুনি আমার কাছে লর্ড মানে ঈশ্বর নয় বরং লর্ড মাউন্টব্যাটেন অথবা লর্ড কার্জনের মতন কেউ ।

আমাদের কলিযুগের **এ্যাফেন্দি** মানে **লর্ড ---**অফ অল ভাইসেস্ !

এখন মিস্টি মাউন্টেন রোড আর ক্যাবেজ ট্রি ক্রিক পার হয়ে চলেছে **Bateman's bay.**

এই অঞ্চল আমার বাসা থেকে অনেক দূরে । আমি পাহাড়ে থাকি । এই এলাকা সমুদ্রতীরে । এখানে সমুদ্রের হাতছানিতে ভুলে মানুষ নৌকাবিহারে যায় । সিগাল পাখি ও রঙীন হাঁসের, অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর এই স্বপ্নরাজ্য ।

যাবার পথে মধুময় সুর । ঘন বন , সবুজ মাঠ, সূর্যমুখী ক্ষেত আর অজস্র ক্যাঙারু । তারপর আবার অরণ্য , ঝর্ণা, শিলালিপি আর

নৈ:শব্দ । আমার বাসার কাছে বহু পুরাতন সব শিলালিপি আছে । পাথরের গায়ে লিখে গেছে কেউ বা এঁকে গেছে । রক আর্ট ।

ট্রেকিং করে যাওয়া যায় । মিথ্ আছে যে এরকম আর্ট শহরের মধ্যেই আছে কিন্তু সেগুলি তর্কের বিষয় । কোথাও খোদাই করা আবার কোনোটা শুধুই রেখাচিত্র , এসব মূল্যবান সব পেন্টিংগুলি অবশ্যই সুরক্ষিত । আমার বাসার কাছে আছে । সুকু আর আমি প্রায়ই যাই ওদিকে । ক্যাঙারুর জন্য কেক বানিয়ে নিয়ে যাই আর সুকু খেতে ভালোবাসে পাঁঠার অন্ত্রের ঝোল যাকে দক্ষিণীরা বলে Kudal Kulambu----

এই পদের নানান সুবিধে আছে । শুনলাম যে এটা খেলে ব্লাড কাউন্ট বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি আর মুখের ঘা সেরে যায় ।

এছাড়া পেটও ভরে যায় ভালো করে ।

আমরা অবশ্য বে-এরিয়াতে মাছ খেলাম । অনেক ফিশিং অর্গানাইজেশান আছে যারা **রাতভর মাছ ধরার** ব্যবস্থা করে থাকে, ওদের বোটে করে নিয়ে গিয়ে । সারারাত উপসাগরে মৎস্য উপাসনা করো । ভোরের শিশির মেখে ফিরে এসো সৈকতে । সেখানে সূর্যের লালিমা মেখে মাছগুলি কেটে , বেছে নাও । তারপর আবার নগরে নোঙর করো । কিছু মাছ উড়িয়ে দিও সমুদ্রনীল বাতাসে ; অলীক কোনো মাছরাঙার উদ্দেশ্যে !

পানকৌড়িকে দিও মাছ ভাজা । আর নিজে খেয়ো তাজা মাছের জীবন্ত মাংস !

The **Snowy Mountains**, known informally as "**The Snowies**", is the highest mountain range on the island country/continent of Australia. It contains the Australian mainland's highest mountain-Mount Kosciuszko, which reaches to a height of 2,228 m (7,310 ft) above sea level. The range also contains the five highest peaks on the Australian mainland (including Mount Kosciuszko), all of which are above 2,100 m (6,890 ft). (wikipedia)

কুমা নামক একটি ছোট শহর থেকে স্নোয়ি মাউন্টেনে যাওয়া যায় । পথঘাট খুব একটা মনোরম না হলেও মন্দ নয় ।

দূরে স্নোয়ি পাহাড়ের হাতছানি । এখানকার মানুষ ওখানে স্কি করতে যায় । বরফ পড়ে । আজকাল অবশ্য ক্যানবেরা , মেলবোর্নেও বরফ পড়ছে । কাল শুনলাম যে মেলবোর্নের কাছে এক ব্যাক্তি, ব্ল্যাক আইসের কবলে পড়ে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে ।

মাথায় অসম্ভব চোট লাগে । দূরের শহর থেকে কিছু নিউরোসার্জেন এবং আরো কিছু চিকিৎসার মানুষ এসে, একটি ম্যাকডোনাল্ডের রেস্তোরাঁর কার পার্কে বসে ; অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে অপারেশান করে মানুষটিকে বাঁচিয়ে তোলেন । এবং এগুলি একমাত্র বিদেশেই সম্ভব । সার্জেনের দক্ষতার সাথে সাথে অন্যান্য সুবিধে থাকা ও প্যারামেডিক্সের সহযোগিতায় মানুষটি নবজীবন লাভ করতে সক্ষম হন । আরো বড় সার্জারির জন্য হাসপাতালে যেতে সক্ষম হন ।

আমরা কাছাকাছি একটি অরণ্যে এক রবিবার কাবাব খেলাম ।

বুনো পাখির ডিম । পাখির বাসা থেকে তুলে এনে সেগুলি মাটির খোলসে পুড়ে অর্থাৎ মোটা মোটা করে মাটির প্রলেপ দিয়ে , কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে ডিমের রোস্ট করে খেলাম । মন্দ নয় খেতে । একটু অবশ্য কুসুমগুলো শুকিয়ে গিয়েছিলো । সেটা তাপমাত্রা আঁচ করতে না পারায় ।

কোথায় জংলী পাখির ডিম পাওয়া যায় সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সঙ্গে এনেছিলাম এক লোকাল তরুণকে ।

এর কাজ, বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পক্ষীশাবক ও ডিম যোগাড় করা । কাজেই আমাদের কোনো অসুবিধে হয়নি ।

বলা হয়নি যে ঐ অরণ্যের একটি শীর্ণ নদীর নাম হাফ মুন ক্রিক ।

আমার ডাক নাম মুনিয়া । আর এটা হাফ মুন । লোকে আমাকে টিজ করে এই বলে যে আমি বড় মুন কারণ মুনিয়া মানে মুনের সাইজ ইয়া --- আর এটা হাফ মুন অর্থাৎ অর্ধচন্দ্র ।

কাজেই পূর্ণচন্দ্র এখন অর্ধচন্দ্রের পাশে বসে পাখির ডিমের কাবাব ভক্ষণ করছে ।

এখানে বসেই ভিসা বালাজির কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম । একটি দক্ষিণী যুবক এখানে এসেছে ঐ মন্দিরে মানত করে, চটপট ভিসা পেয়ে । ওর ভিসা পেতে অসুবিধে হচ্ছিলো ।

ঐ মন্দিরে পুজো দিয়ে তবেই ভিসা হস্তগত করেছে । মন্দিরের নাম **Chilkur Balaji Temple------!**

দক্ষিণ ভারত মিথিক্যাল এলাকা । ভিসা বালাজি তো মন্দির আর ওয়ানাডের কাছে আছে চেন ট্রি । একটি গাছকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে । ওখানে এক আদিবাসী পুরনো দিনে- বৃটিশদের সাহায্য করে বনের মধ্যে দিয়ে পথ নির্মাণ করতে । রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে লোকটি নিহত হয় । সম্ভবতঃ বৃটিশের হাতেই ।

তারপরে ঐ অরণ্যপথে উৎপাত শুরু হয় । বহু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় --একের পর এক । লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ঐ প্রেতাত্মা এইসব কান্ড ঘটাচ্ছে । তখন এক লোকাল প্রিস্ট একটি মন্ত্রপূতঃ শিকল দিয়ে গাছটিকে বেঁধে দেন । মানে ঐ স্পিরিটকে গাছে আটকে দেন । তারপর থেকে গাড়ি দূর্ঘটনা আর হয়না ওখানে । আমি এই শৃংখলিত গাছটি নিজ চোখে দেখে এসেছি । ভিসা বালাজি মন্দিরে অবশ্য যাইনি ।

ক্যানবেরায় হট এয়ার বেলুন ট্রিপে গিয়েছিলাম আমি । কিন্তু পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন ; আমি ভয়ের চোটে ঐ বেলুন সফর করতে পারিনি । শকুনি করে এসেছে । বললো যে এই সফর সবার একবার করে করা উচিৎ ।

আমি আসলে ঐ মাথার ওপরে ফস্‌ফস্‌ শব্দে --দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলা অগ্নিশিখা দেখে একটু ভয় পেয়ে যাই । তবে ইউ-টিউবে ভিডিও দেখালো শকুনি, **বর্মা** সম্পর্কে । ওখানে হট এয়ার বেলুন সফর

দেখলাম । মনে হল যেন আমি এই ভার্চুয়াল বেলুনে চড়ে পুরো বর্মা ঘুরে নিলাম । বর্মা যতটুকু দেখলাম মনে হল আরেক ভূটান ।

বড় বড় গুম্ফা , স্বর্ণালী সন্ধ্যা ঝরানো প্যাগোডার সোনালী চূড়ার ওপর দিয়ে মানসিক বেলুন সফর অসম্ভব নস্টালজিয়ার সৃষ্টি করে ।

পুরানো সমস্ত স্তূপ রয়েছে । দেখে মনে হয় আমাদের সাঁচী, সারনাথের মতন । খয়েরি, ভগ্ন স্তূপগুলি মনে এক মাদকতার সৃষ্টি করে । স্তূপ মহুয়ায় ভেসে যাই সেইসময় যখন বর্মার মানুষ এইসব শৈল্পিক স্থাপত্যের জন্ম দেয় । আমার এক দিদা এখন আমেরিকায় থাকেন , উনি অনেকদিন বর্মায় ছিলেন ।

এখন ইন্ডিয়ানাপোলিসে আছেন । অনেক গল্প শুনেছি ওঁর কাছে এই বর্মা সম্পর্কে । এখন ইউ-টিউবের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ভ্রমণ করতে পেরে নিজেকে এক বর্মি বুড়ি মনে হচ্ছে ।

অর্ধশতাব্দীর দোরগোড়ায় যার বয়স সে যুবতী তো নয়ই !

<u>**কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের**</u> গল্প শুনছিলাম এক অ্যাফ্রিকার মানুষের মুখে । এই পাহাড় নাকি আমাদের হিমালয়ের মতন ।

নামটি রহস্যাবৃত আর পাহাড়টি সার-রিয়াল । এখানে যেমন বরফের মালা আর ভাস্কর্য আছে সেরকমই আছে লাভা স্রোতের গল্প --তথ্য সঠিক কিনা বলবেন ভূ-তাত্ত্বিকগণ । আমি এখানে কোনোদিন যাইনি । লোকমুখে শোনা । পর্বতটি নাকি হঠাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে একটি সমতল ভূমির ওপরে ।

আন্তর্জাল জানাচ্ছে নিচের জিনিসগুলি : :

Kilimanjaro is the highest mountain in Africa at 19,341 feet (5,895 meters), but it isn't a mountain in a traditional sense. It is a giant stratovolcano that began forming about a million years ago and is composed of many layers of hardened volcanic ash, lava, pumice and tephra — fragmental material that is the fallout from a volcanic eruption-- A number of theories exist about the meaning and origin of the name. One theory is that the name is a mix of the Swahili word Kilima, meaning "mountain," and the KiChagga word Njaro, loosely translated as "whiteness." Another is that Kilimanjaro is the European pronunciation of a KiChagga phrase meaning "we failed to climb it."

One of the Seven Summits (the highest peaks on the seven continents), Kilimanjaro is in Tanzania in east Africa. Kilimanjaro lies within the 292-square-mile (756 square kilometers) Kilimanjaro National Park. Kilimanjaro rises from its base approximately 16,732 feet (5,100 meters) from the plains near the Tanzanian municipality of Moshi, making it the tallest free-standing mountain in the world.(Live science website, internet)

এই মেয়ে ট্রাইবাল গয়না নিয়ে কাজ করে । ওর একটি বুটিক আছে যেখানে ও নিজে বিভিন্ন গয়না তৈরি করে আদিবাসী স্টাইলে । অনেক গয়না ও নিয়ে আসে নানান কমিউনিটির কাছ থেকে কিনে । সেগুলি এথনিক আর অথেন্টিক ।

আদিবাসীরা নানান স্পিরিচুয়াল জিনিস , আদবকায়দা , আভিজাত্য ইত্যাদি গয়নার মাধ্যমে নাকি ফুটিয়ে তোলে । সহজলভ্য বস্তু দিয়ে গয়না বানানো হয় ।

কয়েকটি উপজাতি আছে যারা বিভিন্ন পাথর ব্যবহার করে ওদের কারুকার্যে । লোকাল স্টোন সব । কিছু পাথরের হিলিং এফেক্ট থাকে । জুনি, কুচি, পেরুর সমস্ত গয়নায় নানা পুঁথি, পাথর , রূপা ও তামার চাক্তি ব্যবহৃত হয় । আফগান উপজাতিরা একটি বহুমূল্য পাথর দিয়ে গয়না বানায় । রং গাঢ় নীল, নাম : Lapis Lazuli

একটি ওয়েবসাইটের হদিস্ দিলো মেয়েটি ।ওর নাম শঙ্খিনী । শঙ্খিনী ভট্টরাই । ভট্টাচার্যকে হদিস দিলো ভট্টরাই । মজার ব্যাপার তাই না ?

ওর আসল নাম ভিন্ন ; আমি ওকে এই নামে ডাকি ।

আমার যাকে যা ইচ্ছে সেই নামে ডাকবো ।

ওয়েবসাইটের নাম : http://tribalmuse.com

এবার উপজাতি থেকে চলে যাই সোজা আমেরিকায় । স্বপ্ননগর । পরীদের দেশ । আমি ইস্ট কোস্টে গিয়েছিলাম মামাবাড়ির আদর খেতে । ডেলাওয়্যারে ছিলাম । ওখান থেকে ক্যানাডায় , নায়গ্রায় যাই । সারারাত ধরে মজা করতে করতে যাই । পথে থেমে নানান জায়গায় কফিপান আর হ্যালাপিনো ভাজা খাওয়া এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা । ভোরে পৌঁছাই নায়গ্রা । লোকে এই জলপ্রপাতের এত প্রশংসা করে । আমার মনে হল এই ঝর্ণা দেখতে এসে আমি ভুল করেছি । নগরের দাপটে ঝর্ণা কুপোকাৎ । চারপাশে বড় বড় কংক্রিটের বিল্ডিং । একটি বিল্ডিং-এ কাঁচের লিফট্ আছে । তাতে চড়ে এত স্পিডে ছাদে উঠলাম যে মনেই হলনা এতটা হাইটে উঠে গেছি মূহুর্তের ভেতরে ।

সেখানে ফটোশপিং করা নানান ঝর্ণার ছবি তুললাম । আমরা ঝর্ণায় বসে আছি । নৌকা বেয়ে চলেছি । ইত্যাদি । ১৯৯৬-৯৭ সালে আমি যখন ফটোশপ শিখি , অ্যানিমেশানের কোর্সে তখন লোকে এগুলি জানতো না । এখন সবাই জানে , বোঝে, করে । এরই নাম প্রগতি ।

অনেক আশা নিয়ে গেলেও আমি নিরাশ হয়েছি --- **নায়াগ্রায় চেতনা নেই । নায়াগ্রা সেলিব্রিটি , একটি মিথ্ । নায়াগ্রায় প্রাণ নেই । মিস্ উইনিভার্স । নারী নয় ।**

এরকম বিশ্রী একটি জলপ্রপাত দেখার জন্য এতটা পথ পাড়ি দেওয়া খুবই বিরক্তিকর । বরং আমি **লং উড গার্ডেন** দেখে খুবই খুশী হয়েছি । এত সুন্দর আর এত প্রজাতির গাছে নিপুনভাবে সজ্জিত যে প্রাণে সবুজ লাগে । http://longwoodgardens.org/

সজীব হয়ে ওঠে সমস্ত অবসাদ । ফুরিয়ে যায় একাকিত্বের স্কার । নি:শেষ হয়ে যায় বাগানের স্পর্শে । যদিও ঐ বাগানে ফুল তোলা মানা তবুও ফুলের হাসি দেখেই মুগ্ধ হই ।

পারিবারিক আড্ডায় বেশি ব্যস্ত ছিলাম আমি । এছাড়া কিছু সৈকতে ঘুরেছি । নিউ ইয়র্কের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে যাইনি । আমি অফ্‌বিট স্থানে ঘুরতে ভালোবাসি ।

ক্যানাডায় গেলাম । একদিন ছিলাম । টরন্টো মার্কেটে ঘুরে অনেক কিছু কিনলাম । ভারতীয় খানা খেলাম ।

আমেরিকা আমার খুব ভালোলেগেছে ।

আমেরিকা সত্যি স্বপ্ন নগর । সচল হিউম্যান রাইটস্ , সাবলীল মানুষ আর প্রযুক্তিগত-ভাবে অনেক এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে আমেরিকা এখনও মানুষ । Magic Realism.

কেবল আমাদের অস্ট্রেলিয়ায়, আন্তর্জাতিক বিমানে ভ্রমণের সময় এত কড়া চেকিং হয়না আর অফিসারেরা খুবই বিনয়ী । আমেরিকায় জুতো পর্যন্ত খুলে চেকিং এরিয়াতে ঢুকতে হয় দেখলাম ।

কানেক্টিং ফ্লাইট মিস হয়ে যায় তাই টেক্সাসে আমাদের চার-পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় অন্য প্লেনের জন্য । **মিস হয় কিন্তু এয়ারপোর্টের গাফিলতিতে** । আমাদের কোয়ান্টাস্ প্লেন সময়মতনই আমাদের পৌঁছে দিয়েছিলো কিন্তু টেক্সাসের কাস্টমস্ আমাদের দেশে ঢুকতে দিতে গাফিলতি করায় ফিলাডেলফিয়ার ফ্লাইট মিস হয়ে যায় ।

Qantas এ চড়ার আগে আমরা সবজায়গায় বিজনেস ক্লাসের ওয়েটিং এরিয়াতে ছিলাম । স্পেশাল খানা , গানা , বাজানা ।

টয়লেটগুলি প্যালেসের মতন । দিশেহারা হতে পারেন ।

আমাদের এক দক্ষিণী বন্ধু ,একটু কালোবরণ (আমারই মতন)

তো সে একবার সিডনিতে ঐ বিজনেস ক্লাসের এরিয়ায় ঢুকতে যাচ্ছিলো । নিজে বিজনেস করে । ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে ।

মাজেরাটি চড়ে । সেই গাড়ি সার্ভিসিং করতে ক্যানবেরা থেকে সিডনি যেতে হয় প্রতিবার । সেই বন্ধু দেখতে একটু কমেডিয়ান জনি লিভার- টাইপস্ তো ওকে ঐ স্পেশাল এরিয়ায় ঢুকতে দেখে এক **বত্তমিজ্** ভারতীয় বলে বসে: : :

আপনার ওয়েটিং জোন ঐদিকে । এটা রিচ্ অ্যান্ড ফেমাসদের জন্য ।

এদের ভয়ে আমি বোরখা পরে এসব জায়গায় যাই । চেহারা তো বদলাতে পারবো না । যাকে ছেলে-ছোক্‌রাগণ বলে থাকে :: থোব্‌রা । এমন রূপ দিয়েছে নেচার আমাকে যে আমাকে দেখে কারো ফাটবেও না (রণবীর সিংয়ের উক্তি, দীপিকাকে দেখে ক্লাউডের ফাট্‌ গ্যায়ী । ঐ যে বললাম আজকালকার লিরিক্স এরকমই !!)

রিচার্ড ব্র্যান্সানের ভার্জিন গ্রুপও এখানে অপারেট করে । ঐ প্লেনগুলি দুর্দান্ত । আমাদের দেশের হেড এখনও মহারাণী এলিজাবেথ । তাই ইংল্যান্ডের অনেককিছুই এখানে ফলো করা হয় । টুইন দেশ একরকম --বলা যায় ।

আমেরিকা আমাকে মুগ্ধ করেছে ।

এই মহাদেশ আমার সেকেন্ড হোম । এত আত্মীয় ও বন্ধু আছেন এখানে । সবার সঙ্গে এক যাত্রায় দেখা করা সম্ভব নয় । তবুও অনেক হৈ হৈ হয়েছে । ফ্যামিলিকে মিট করেছি বহুদিন পরে তো তাই !

আমেরিকা আমেরিকা তুমি নাকি ইউরেকা ,

সবাই তোমায় চায় ।

তবুও কি পায় ? কতনা মানুষ মূর্ছা যায়

যদি আমেরিকায় না যায় ।

আমেরি-ই-কা ! টুকি , টুকি , আমি এখানে !

তুমি কি তুলিরেখা ?

নাকি সত্য ? তুমি নাকি নক্ষত্র?

যে দাঁড়িয়ে ভূতলে , **প্রবল বাহুবলে রাজাধিরাজ**

তবুও কিছু কিছু বামন তোমায় ভাবে মরীচিকা

এই যেমন আমি , তাই লুকোচুরি খেলি তোমার সাথে

তুমি পতঙ্গ পোড়ানো এক বহ্নিশিখা ।

এখানে **হুটার্স** নামক রেস্তোরাঁতে একবার খেলাম । বন্ধুরা মিলে ।

শুনেছিলাম এর কথা আগেই । কাজেই অবাক হইনি মেয়েদের দেখে ।

A bikini barista is a person who prepares and serves coffee drinks while dressed in scanty attire such as a bikini or lingerie. In the United States, this marketing trend, sometimes referred to as sexpresso or bareista originated in the Seattle, Washington area in the early 2000s—(Wikipedia)

এখানেই এক মিডিয়াম আমাকে সর্বপ্রথম বলেন : **ইউ হ্যাভ ক্যান্সার ইন ইওর বডি ।**

এখানে বসে কিছু আলাপ প্রলাপের পরে মামাবাড়ি ফিরতেই মামা বলেন : তুই ঐ মিডিয়ামকে গিয়ে বল যে আমি এখানে বেড়াতে এসেছি আর তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো ? তোমাকে আমি **সু** করতে পারি ।

আমেরিকা সু-করার জন্য বিখ্যাত । কিন্তু আমি সেদিকে পা বাড়াইনি । ফিরে এসে শুরু হল টপ্ টু বটম ইনভেস্টিগেশান ।

আমেরিকায় বসেই গোয়া ভ্রমণের কথা মনে পড়ে । মাইমাকে বলছিলাম কী সুন্দর ছিলো সেই ব্যাঙ্গালোর থেকে গোয়া যাবার পথ । বনের মধ্যে দিয়ে, বনমল্লিকার ঝাড় পেরিয়ে , কখনো সাগরের ঢেউ তো কখনো অলস পাহাড় দুই চোখে মাখিয়ে পৌঁছাই গোয়া , কাকভোরে । কাকজোছনা মেখে ।

একটি পুরনো রিসর্ট-এ আমরা ছিলাম । ওল্ড, শ্যাটার্ড মিউজিয়ামের মতন এবং যথারীতি ভৌতিক আহবান ।

আমার পরিবারের লোকেরাও ছিলো সঙ্গে । গোয়ায় আমরা কিছু পর্তুগিজ -ভিলা দেখেছি । নারিকেল বনের মধ্যে হারিয়ে গেছি । সমুদ্র মন্থনে ভরে উঠেছিলো হৃদয় শয্যা । ঢেউ এর পরে ঢেউ , নীল ঢেউ ধেয়ে আসে পুরনো গন্ধমাখা ঘরের অলিন্দে ।

অন্য কোনো একদিন আমরা গেলাম অনেক দূরে একটি গীর্জাতে । ওখানে একটি মমি দেখেছি । এছাড়া কিছু পর্তুগিজ মানুষের সাথে আলাপ হল । তারা আর আজ কেউ সাহেব নেই কিন্তু ধরে রেখেছে যীশুত্ব খানি । অনেকে বিদেশে চলে গেছে । রয়ে গেছে কিছু বংশধর এখানে । রৌদ্রছায়ায় ।

ভারতের মতন রক্ষণশীল দেশে গোয়া এক চিলতে রোদ্দুর ।

যেখানে বসে পোর্ট ওয়াইন কিংবা রেড ওয়াইনে ঠোঁট ভেজালেও কেউ মন্দ বলবার নেই । যেখানে খোলামেলা পোশাকে নিজেকে মেলে ধরে হারিয়ে যাওয়া যায় নীল গগনে ।

চিক্‌নি চামেলি গানের তালে তালে । আইটেম সং এখন কমন । কিন্তু তখনও গোয়াতে এগুলি ছিলো সহজ স্বাভাবিক । অর্থাৎ খোলামেলা সংস্কৃতি ।

নারিকেল তেলে রান্না করা মাছ বিশেষ উপাদেয় । আমি গোয়ান ফিশ কারি বাড়িতেও বানাই । অবশ্যই নিজ এস্টাইলে ।

বলিউড **luminary --**সঞ্জয় দাতের, মান্যতার সাথে বিয়ে নিয়ে হুলুস্থুল হয় যখন তখন জেনেছি যে গোয়ায় নাকি অন্য কোনো বিবাহ আইন মজুত আছে । ভেরি ভেরি গোয়ানিজ ।

মাইমার এক মেসোমশাই মারাঠি । কাজেই ওরা মারাঠা সম্পর্কে অনেক জানলেও, গোয়ায় যায়নি কোনো অজ্ঞাত কারণে । আমার কাছে এই সমুদ্রনগরের বিবরণ শুনে বললো ::: এবার দেশে গেলে গোয়ায় যাবোই ।

এরকম অনেকেই আমাকে বলেছে ::: এবার দেশে গেলে অমুক জায়গায় অবশ্যই যাবো । যেমন উটি । আগে উটিকে টিলা ভাবতো কিন্তু আমার লেখা পড়ে জেনেছে যে ঐ পাহাড়ও ,মাধুরী ঝরাতে অভ্যস্ত । আবার হিমালয়ের অনেক জায়গার কথা আমার কাছে জেনে অনেকে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ।

কিন্তু এখানে চুপিচুপি বলে রাখি যে এইসব বিবরণে কিন্তু আমি ভালই রং আর স্পাইস চড়িয়ে থাকি । একেবারে ১০০ পার্সেন্ট গোয়ানিজ ফুডের মতন ।

কৈশোরে একবার পাড়ায় রটিয়ে আসি যে আমাকে বাড়িতে খেতে দেয়না আর ঘরে আটকে রেখে মারধোর দেয় । একটি কচি শিশুকে এইভাবে আটকে রাখলে তার কেমন লাগে ?

পরে রাস্তায় এক পড়শী আমার বাবাকে ধরেন ।

--এই যে ডঃ রায় ,আপনি সমাজসেবা করে বেড়ান । আর নিজের মেয়েকে খেতে দেননা ? ঘরে এইভাবে একটা বাচ্চাকে আটকে কষ্ট দেন ? মেয়েটা সব বলেছে আমাদের । ছিঃ ছিঃ ! চ্যারেটি বিগিন্স অ্যাট হোম্ , জানেন না ?

বাবা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বলেন : **আরে ওর কথা ! ও গপ্পো বলে বেশি, কাজের কথা কম । ফ্যাক্ট কম ফিক্শান বেশি !**

<u>কাজেই সেই একই লোক বিহরণ লিখলে- কী হবে ?</u>

****

শকুনির সাথে ঘুরে এলাম মেকেদাতু । দক্ষিণ ভারতে ।

সবুজ ভূমি আর ইতিউতি জংলা পথ পার হয়েই মেকেদাতু যার অর্থ 'goat's leap' ----

কথিত আছে যে একটি ছাগশিশু, একবার প্রাণভয়ে একটি পাহাড়িয়া পথ পার হতে যায় । কোনো হিংস্র পশু তাকে তাড়া করে সেইসময় । নিচে খরস্রোতা নদী আর দুইপাশে পাহাড় । সেই অংশটুকু পার হতেই প্রাণটা বাঁচে । সেইসময় থেকে এই অঞ্চলের নাম নাকি মেকেদাতু ।

আগে অবশ্যই একটি বিশাল নদী পার হতে হয় ঐ ছাগলস্ফের জায়গাটি দেখতে গেলে । আমরা দুজনে আরো অনেকের মতন পায়ে হেঁটে নদী পার হই । কোমড় অবধি জল । আস্তে আস্তে হেঁটে পেরিয়ে যাই নদী । নদী খরস্রোতা নাহলেও ভালই জল তাতে । যাবার আগে পাড়ের কিছু দোকানে উদ্ভট সবজিসহ ইডলি ভক্ষণ করি । বস্তুটি পটল আর শসার মাঝামাঝি কিছু একটা । আর তাতে না কোনো স্বাদ আছে না কোনো গন্ধ । আর একগাদা নারিকেল দেওয়া । অনেক মানুষই অবশ্য সেই সবজি গোগ্রাসে খাচ্ছে । শকুনির খুব একটা মনোমত হয়নি বোঝা গেলো । মুখটা কেমন পান্‌সে হয়েছিলো ।

পরে সে মেকেদাতুর কাছে গিয়ে কিছু porcupines মেরে খায় ।

মাংস বার করাই এক দায় তবে শেফ যেখানে শকুনি সেখানে কোনো ভয় নেই । ওর এক পাশার চালেই এই ক্ষুদ্র জীব ফিনিশ ! ভিয়েতনামে নাকি লোকে খায় । আমার আবার ভিয়েতনাম শুনলেই **বলাই স্যার রম্যরচনার নায়কের** মতন মনে হয় যে এই দেশ লাতিন আমেরিকায় । একে এশিয়াতে ঢোকাতে আমি কিছুতেই সক্ষম নই । কেন কে জানে ! **মেন্টাল ব্লক !** কাজেই আমার ভিয়েতনাম সেই লাতিন আমেরিকায় ।

কী অসুবিধে ? আমি কি গিয়েছি কোনোদিন ? তাহলে এশিয়ায় হলেই বা কি আর সাউথ আমেরিকায় ? ও তো নিজস্ব স্থানেই আছে । আমার ভাবা দিয়ে কী হবে ?

এখান থেকে গেলাম সোজা শনি সিংহ্‌নাপুর । আগে ওখানে নারীদের প্রবেশ নিষেধ ছিলো । এখন নাকি চালু হয়েছে ।

শকুনিকে অবশ্যই সাদরে ভেতরে নিয়ে গেলো । শকুনি যেতে পারে আর আমার মতন এক সহজ, সরল, ভালোমানুষ যে কখনো কারো ক্ষতি করেনি , পাশা খেলেনি সে যেতে পারেনা !

যাইহোক ওখানে দেখি সমস্ত গ্রামের বাড়ির- দরজা আর জানালা খোলা কেবল ফ্রেম বসানো । ওখানে নাকি তস্কর নেই । কেউ চুরি করে পালাতে গেলে শনিদেবের কোপে পড়ে ।

শনিকে সবাই ভয় পায় । আসলে নিজের কর্মা নিজের কাছে ফিরে আসে । **স্যাটার্ন ক্যান বি আ গুড ফ্রেন্ড, টিচার অ্যান্ড গাইড ।** বলেছিলেন এক জ্যোতিষি আমাকে ; বহুদিন আগে ।

আমার অ্যাসেন্ডেন্ট (লগ্ন) লর্ড শনিদেব । কাজেই আমি ওঁকে অত ভয় পাইনা !!

আমাকে অনেকে বলেন যে আপনি তো কোনোদিন কোনো বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ পাননি তবুও এত বই লিখেছেন যা পড়তে ভালোলাগে , এই কনফিডেন্স কোথায় পেলেন যে আপনার বই লোকে কিনে পড়বেন ?

বিজ্ঞের মতন হাসি যথারীতি যেন উল্টোদিকে এক মেষশাবক !

বলে উঠি : হে হে , আ যোগকারক, এক্সালটেড্ ভিনাস সিটিং ইন দা মঘা নাক্সাত্রা (নক্ষত্র) ইন লিও---ইন মাই বার্থ চার্ট কাজে কাজেই গুড থিংক্স আর বাউন্ড টু হ্যাপেন ! শ্রাগ করি একটু ---- বাউন্ড টু হ্যাপেন । চিবিয়ে বলি -- আমি এখন বেস্ট সেলিং অথার ।

ট্যাটু অবশ্যই করা হয়নি এখনও।

শনিদেবের মন্দির থেকে গেলাম শিরডি ; সাঁইনাথের মন্দিরে । ওখানে পরিচ্ছন্ন মন্দির দেখলাম । লোকাল হোটেলে ভড়াপাউ খেলাম । সাঁইনাথের বিভূতি নিলাম । ওঁর একটি ঘোড়া ছিলো । সেই অশ্বের সমাধি আছে । সেখানে গেলাম । বিখ্যাত রোগভোগ সারানো নিমগাছের ছায়ায় বসলাম । বিভূতি, দিয়া আর অশেষ ধুনোর গন্ধ এক অবিনশ্বর আলো আনে শিরডিতে । তবে আমার ব্যাক্তিগতভাবে মনে হয় যাদের কর্মে থাকে তাদেরই সমস্যা মেটে , সবার নয় ।

এবার যাবো গোয়ালিওর । অনেক শুনেছিলাম এই রাজনগর সম্পর্কে কিন্তু আমার মন ভোলাতে পারেনি । রাজপ্রাসাদটি অসম্ভব কদর্য । অনেক ঘুরে দেখলাম । কামান রাখা আছে । প্রাসাদের পাদদেশে বসে শকুনি গরমাগরম চা খেলো, আদা দেওয়া । সঙ্গে সামোসা । একটু আগেই আমরা তানসেনের সমাধি ঘুরে এসেছি । জায়গাটি খুব শান্ত ও সুন্দর কিন্তু সমাধিস্থল অনাদৃত । এতবড় একজন গায়কের কথা আজ আর কেউ মনেই রাখেনা ! সঙ্গীতের আসর হয় যদিও কিন্তু এগুলি হল নিমপাতা খাওয়ার মতন । স্বাস্থ্যের জন্য খাওয়া ।

টোরি, মল্লার আজকাল ইন্সট্যান্টের যুগে অবাঞ্ছিত । কিছুটা নিমরসের মতন । তাই হয়ত তানসেনের ভাইব্রেশান আজ স্তব্ধ ।

আসলে সময় সব ভুলিয়ে দেয় । যা ওপরে ওঠে তা নেমেও যায় । এইভাবেই এগিয়ে চলে যুগের রথ । ভেসে যায় সোনার তরী অন্য কোনো ঘাটের খোঁজে । নদী হারায় পথ , হয় বুঝি অন্ত:সলিলা ।

একটি কবিতা আছে : **ছুটেছে কালের রথ , ছেড়ে দিতে হবে পথ , নতুন তরঙ্গ আসে যায় ।**

তানসেন আসে যায় , আসে যায় । শচীন দেববর্মণ আসে যায় ।

থেকে যায় সেতারের সুমধুর ধ্বনি । হংসধ্বনি হয়েই ।

ভাইব্রেশান । তরঙ্গ । এগুলি অলীক কিংবা মিথ্যে নয় ।

কখনও কর্ণকুহরে বাজে কখনো বা আত্মার স্বর্ণাভ গুহায় ।

ভাইব্রেশানই তো জীবন ।

The whole universe is vibrating …………………

গোয়ালিওরে এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিলাম । ভদ্রলোক আগে ছিলেন এয়ারফোর্সে ,এখন অবসর নিয়েছেন ।

ওখানে বসেই বাঙালি মাছের ঝোল আর চিকেন কারি খেলাম গোগ্রাসে । শকুনিকে পেয়ে ওদের বাড়ির ছোটরা অবাক আর খুশি ।

গোয়ালিওর তো রাজাদের জায়গা কাজেই ওরা মহাভারতের এক হাফ রাজাকে পেয়ে অসম্ভব আনন্দিত ।

সেদিন ছিলো মহা কুয়াশা । তবুও সন্ধ্যায় আমরা গেলাম লোকাল এক মেলায় । গ্রামীণ মেলা । অনেক কাঁচের চুড়ি কিনলাম । পেস্তা রং, গোলাপী , বেগুনী , মেহগনি ।

শকুনির ক্রেডিট কার্ড আছে। অন্য জগতের অবশ্যই। নক্ষত্র থেকে পেড়ে আনলো। দূর্দান্ত ব্যাপার।

একটি গেস্ট হাউজ ভাড়া নিলাম। এক ছোক্‌রা ওখানে রান্না করে। ও মাথা খাটিয়ে নানা ভেজিটেরিয়ান পদ রান্না করে দিতো আমাদের। চমৎকার হত।

কিশোর একটি। নাকি সাতবছর বয়স থেকে কাজ করছে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করে। চলে অনেক রাত অবধি।

এখন গেস্টহাউজে কাজ করে।

সপ্রতিভ কিন্তু করুণ ওর চোখদুটি। তাই বুঝি ফেরার সময় শকুনি ওকে গ্রামীণ মেলা থেকে কেনা এক প্রাণবন্ত জুতো আর অনেক মোহর দিলো। এই মোহর ভারতীয় টাকায় বদলে নিলে ঢের বেশি হবে। ছেলেটির নাম মান্ডওয়া। মান্ডু বলে লোকে ডাকে। মান্ডওয়া আজ ভারি খুশি। নক্ষত্র মোহর পেয়ে নয়, একজন ভালোমানুষের দেখা পেয়ে ওরফে মহাভারতের শকুনি।

গোয়ালিওরে দেখার আরো অনেক জিনিস আছে। কয়েকজন নরেশের প্রাসাদ, কিছু শিলালিপি আর সিন্ধিয়ার মিউজিয়াম তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা এগুলি দেখলেও গোয়ালিওর আমার সেরকম ভালোলাগেনি। শকুনিকে বললাম। সে বললো ::: এগুলি প্রাচীন শহর আর তুমি থাকো পশ্চিমে তাই হয়ত এদেরকে গুহামানব ভাবছো।

গুহামানব ভাবছি না গোয়ালিওরকে তবুও আভিজাত্য যেন মাইনাসে আর মহাশুন্যতার রেশ লেগেছে প্রতিটি সর্ষে আর মূলো ক্ষেতে ।

তবে প্রতিটি নগরই স্বরূপে আদৃত । সমস্ত জায়গার একটা রেশ আছে । স্পন্দন আছে । সেটা স্পর্শ করতে পারলে ভালোলাগে ।

এক কাকভোরে কুয়াশা কেটে চললাম দিল্লী অভিমুখে ।

আসার সময় চম্বল পেরিয়ে এসেছিলাম । দুর্ধর্ষ সব তস্করের কথা শুনলেও এখানে সেরকম কিছু দেখিনি ।

ওঁৎ পেতে ছিলাম । কিন্তু ডাকাতের **ডাকাতে কালী** আমাকে রক্ষা করলেন । আমার ঠাকুর্দার বাবা একসাথে চিকিৎসক আর তান্ত্রিক দুটৈ ছিলেন । তবে কারো ক্ষতি করেন নি ☺ ।

তাই হয়ত ঠগীদের দেবী, লোলজিহ্বা - ডাকাতে কালী আমাকে রক্ষা করলেন !

ডাকাতে পাতা দিয়ে নাকি ক্ষতস্থান জোড়া যায় । শকুনি বললো । বললো ::: চম্বলে যদি ডাকাতে ধরে আর মুন্ডচ্ছেদ করে তাহলে আমি ডাকাতে পাতা দিয়ে জুড়ে দেবো তোমার মাথা ! শিরচ্ছেদ হলেই বা কি ?

বাহা বাহা এই নাহলে শকুনি !

জমে গেলো এবার ।

কুয়াশায় প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না । এত ফগ । গাঢ় কুয়াশা । কিন্তু বিমান ধরতে যেতেই হবে । এক হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছেনা ।

দূর্ঘটনার ভয় ছিলো । পথে তাজমহল দেখে এলাম । আগে কখনো যাইনি । ঢুকে দেখি তাজমহল পুরো লাল ।

শকুনিকে বললাম : তাজ তো শুনেছি শ্বেতশুভ্র । এ তো গাঢ় লাল ! পলিউশান নাকি ?

শকুনি গলা ঝেড়ে বলে : ওহে, না হে এটা অন্য একটা স্থাপত্য । তাজমহল ওদিকে । তবে এটাও খাসা !

সত্যি তাজমহল আর দেখবো কি ? পুরো কুয়াশা মোড়া !

আমার আবার শাহজাহানের সাথে সেরকম দস্তি নেই । মমতাজকে নিয়ে আমি ফ্যান্টাসাইজ করিনা । আমি আনারকলির ফ্যান । কাজেই খুব একটা গায়ে কাঁটা ফাঁটা দেয়নি ।

এক রিক্সাচালক শকুনিকে দেখে ৫০০ মিটার যাবার জন্য ২৫০ টাকা হেঁকে বসে । শকুনি প্রায় দিয়ে দিচ্ছিলো ।

আমি ওকে বারণ করি ।বলি :: এরা তোমার থেকেও বেশি শয়তান ।

মনে মনে রিক্সাচালকের তারিফ না করে পারিনা ।

শেষমেষ শকুনি বধ ! সার্থক হল জনম্ তোমার রিক্সাচালক , মাধবী তোমার না হলেও শকুনিকে টিপে মেরেছো !

উজ্জ্বল গোয়ালিওর শেষ হল কুয়াশায় , প্লেন প্রায় মিস্ হয়ে যাচ্ছিলো । ফোন করে শকুনি ওকে থামতে বলে । পাইলট ; শকুনি ফোন করেছে দেখে প্রায় অক্কা !

আজকালকার পাইলটরা ইতিহাস পড়ে তাহলে ! (Mythology and history)

<u>বস্তাপচা ইতিহাস সব !</u>

গম্ভীর গলায় কাপ্তান ডোডিয়া জানতে চান- মিস্টার শকুনি তোমার টুইটার অ্যাকাউন্ট্‌টা কী ?

মান্ডওয়া ওরফে মান্ডুকে বড় মিস করি এখন । ওর সরল আঁখিজোড়া । আর অঢেল স্বাদের সমস্ত নিরামিষ মিস করি আমি । আগে নিরামিষ দেখলেই হাসপাতালের ডিশ মনে হত ।

তন্দুরুস্ত , স্বাস্থ্যের জন্য এইসব । আর পতি -ফতি মরে গেছে টাইপস্‌ । এখন ভেতো বং আমি গোগ্রাসে নিরামিষ খাই ।

আপনাদের ভান্ডারে বিবিধ রতন ---কাজেই ভালো রান্না থাকলে ইউ -টিউবে তুলে দেবেন আমি শিখে নেবো আর তার আগে মনে মনে খাবো । **<u>আমি হ্যাংলা অ্যান্ড আই অ্যাম নট অ্যাশেমড্‌ অফ দ্যাট ☺</u>**

মহাবালেশ্বরে গেলাম আমি ও শকুনি মানে সুকু ।

পুণা থেকে যাত্রা শুরু । পাহাড়ের পাদদেশে একটি ধাবায় খেয়ে নিলাম এগ ভুর্জি ও নরম গরম রুটি । ডিমের এই বিশেষ কারি খুবই সুস্বাদু লেগেছে সুকুর । একটি গাড়ি ভাড়া করে আমরা পৌঁছাই মহাবালেশ্বর । রাস্তায় প্রচুর সুড়ঙ্গ পার হই ।

আমার সুড়ঙ্গে ঢুকতে বেশ মজা লাগে । বিদেশের টানেলগুলি তো অন্তহীন । আর খুব স্পিডে গাড়ি যায় । অন্যরকম অভিজ্ঞতা একটা । মহাবালেশ্বরের সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড় কেটে এগিয়ে যাই শৈলশহরে । ওখানে একটা বড় জায়গা আছে যেখানে সমস্ত হিন্দি সিনেমার শুটিং হয়ে থাকে ; ঐ জায়গায় এক টাঙ্গা চালককে দেখি । সে বাঙালী । মহাবালেশ্বরে ঘোড়ায় টানা গাড়ি চালায় ।

ও বললো ::: এখানে মাধুরী , ঐশ্বর্য সবাই আসে । শাহরুখকে দেখেছি । সবাই এখানে শুটিং করে ।

আমি মুম্বাইতে এসেছিলাম হিরো হবার জন্য । এখন জিরো হয়ে এখানে আছি । তবে হিরো-হিরোইন সবাইকে দেখি আর মন ভরে যায় । নিজের হিরো না হতে পারার কষ্ট আর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনা । আমি সব ভুলে গেছি ।

টাঙ্গা চালাতে গিয়ে কত শুটিং দেখি । আপনারা পর্দায় দেখেন । আমি নিজ চোখে ।

ওর কাছে জেনেই গেলাম কোয়েনা নদীর চরে । অপরূপা কোয়েনা এক নীল নদী । এই নদীর বুকে আমরা অনেক বোটিং করলাম । স্পিড বোটে চড়লাম । সুকুর খুব ভালোলেগেছে ।

অনেকটা পথ আমরা নৌকো করে পাড়ি দিয়ে হংসবলাকা দেখে এলাম । কোয়েনার বুকে পারিজাত ফুটেছে । মুখে নেক্টারের পরশ ।

খুব উজ্জ্বল আজ আকাশ । নীল নদী কোয়েনার ওপরে নীল ওড়না জড়ানো মেঘ । কোয়েনা তবুও যেন অসূর্যম্পশ্যা ।

এখানে এক ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ হল । উনি বিদেশ থেকে এসেছেন । মণিপুরী মানুষ । তবে মুম্বাইতে বাস করতেন ।

বাবা একজন আই-এ-এস অফিসার ছিলেন । গুলিয়ন না কি নাম ছিলো ওনার । এই ভদ্রমহিলা বিদেশে আকুপাংচারের শপ চালান । বিজনেস ওম্যান বলেন নিজেকে । ওর স্বামী গাটারের পাইপ, ফায়ারপ্লেস ইত্যাদি বসানোর কাজ করেন । নিজের কোম্পানি আছে । উনিও বিজনেসম্যান । মহিলাকে দেখে বিদেশে, লোকে চীনা ভাবে ।

দুজনের কোনো সন্তান নেই । ভারতে নাকি ওদের আত্মীয় আছে অনেক । তার মধ্যে ওর নিজের ভাইয়ের এক দুরারোগ্য ব্যাধি হয় । ওরা মনে করে যে এই ভদ্রমহিলা বিদেশে থাকেন কাজেই খুব ধনী । তাই ক্রমাগত অর্থ দাবি করতে শুরু করে ।

শেষে আকুপাংচার বিশেষজ্ঞ কোনো কারণে দেশে এসে দেখেন যে ভাইয়ের আদতে কিছুই হয়নি । বিনাকারণে এত অর্থ নিয়েছে ওদের থেকে । মুষড়ে পড়ে বেড়াতে এসেছেন মহাবালেশ্বর ।

ওদের নাকি মাচুপিক্চুতে যাবার কথা ছিলো কিন্তু ভাইকে সাহায্য করতে গিয়ে পেরে ওঠেননি । আবার এখানে এসে দেখেছেন যে সবই মিথ্যে ।

আমাকে মনের দু:খ জানাচ্ছিলেন । আমরা একসাথে স্ট্রবেরি ক্ষেতগুলি ঘুরে দেখলাম । সার বেঁধে কেমন গজিয়ে উঠেছে গোলাপী এই মিঠে রসকলি । স্ট্রবেরি শেক্ খেলাম । বাগানেই পাওয়া যায় । টাট্কা ফলের সুধা ও ঘ্রাণ নিলাম । স্ট্রবেরি মধুক্ষরা । মুঠো মুঠো ফল পেড়ে নিলাম মাটি থেকে ।

খয়েরি জমিতে সবুজ গাছ । আর অনেক মানুষের কোলাহল ।

গো-কার্টিং করেছি । সুকু, আমি ও এই ভদ্রমহিলা । বিরস বদনে বলেন ::: ভীষণ ভয়ের তাই না ?

ক্যানবেরায় তো পাহাড়ে হর্ণ বাজানোর নিয়ম নেই । এখানে কোনো রাস্তায় কেউ হর্ণ বাজায় না । খুব রুড বলা হয় একে ।

তাই গাঢ় পাহাড়ের বুক চিরে যাবার সময় যেহেতু দুই লেনের রাস্তা তাই হয়ত হর্ণ না দিলেও কোনো অসুবিধে হয়না । মহাবালেশ্বরের কান ফাটা হর্ণে একটু অসুবিধে হচ্ছিলো বৈকি ।

বলা হয়নি আমরা সিংহগড়েও গিয়েছি । এই কেল্লা ভুলেশ্বর পাহাড়ে । নামটা অদ্ভুত তাইনা ? ভুল শুনিনি তো ? হয়ত আসলে ফুলেশ্বর ! কে জানে ?

সিংহগড়ে নাকি ভৌতিক কান্ডকারখানা চলে । রাতে সৈনিকদের চীৎকার , শিশুদের কান্না আর ভয়ার্ত সব মানুষের কান্নার রোল

শোনা যায় । স্থানীয় মানুষেরা নানান গল্পের ঝুলি সাজিয়ে বসে আছে । আমি এই কেল্লায় ওঠার সময় খুব হাঁপিয়ে যাই । একটু লেবুর সরবৎ যা বিক্রি করছিলো দরিদ্র রূপবতীরা খুব ঝকমকে সব পোষাক পরে যেমন গন্ধলেবু রং এর কামিজ, হলুদগাঁদা পাজামা , সবুজ ওড়না , কমলা ওড়না , গোলাপী কামিজ এইসব । গলায় অজস্র সস্তার পুঁথির মালা আর কাচের চুড়ি পরা এইসব মেয়েরা আমাকে আনন্দবারি দিলো । শীতল লেবুর সরবৎ যা পান করে আমার প্রাণ ফিরলো ।

অনেকে ; রং জোছনায় পা ডুবিয়ে বসে ভুট্টা পোড়াচ্ছে । এইসব মহিলাও ব্রাইট সব পোশাক পরা । হাত অসংখ্য কাঁচের চুড়ি ।

বড় বড় উল্কি । আমার ইদানিং খুব ট্যাটু করার সাধ জেগেছে । এদেরকে দেখে সাধ আকাশ ছোঁয় ।

বয়স্ক মহিলারাও উজ্জ্বল রং পরেছে । মাথায় কারো রং-বেরং এর ফুলের মালা জড়ানো । কেউ বৈরাগী হলেও রং চং অঙ্গে মেখে বসেছে । কপালে **ট্যাটু রসকলি** ।

প্রেত মোড়া সিংহগড় আজও মায়াবী । তাই বহু মানুষ এখানে আসে ইতিহাসের প্রেত-পরশ পেতে । কুলধারা গ্রামের মতন । ভানগড় ফোর্টের মতন । মিডিয়ামদের এগুলি পীঠস্থান ।

ঘোড়ার খুড়ের শব্দও নাকি বাতাসে ভাসে প্রতিটি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ।

মহাবালেশ্বরে এক মহিলার সাথে আলাপ হয় । উনি সমাজ সেবা করেন । নানান দেশে ঘুরে বেড়ান । একটি বিদেশী সংস্থার সাথে যুক্ত বলে বহু দেশে যেতে হয় । অনেক জায়গায় মানুষের কোনো বাড়ি নেই । গৃহহীন তারা । সেসব জায়গায় গিয়ে এই মহিলা ও তার সহকর্মীগণ নিজ হাতে বাড়ি তৈরি করে দিয়ে আসেন । প্রাচ্যের দেশেই বেশি যেতে হয় । সমাজ সেবার সাথে সাথে অন্যের বাড়ি তৈরি করার মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে আছে সেটা ওদের খুব আকর্ষণ করে । বারবার ছুটে যান সেইসব দেশে । গত দশ বছরে নাকি মোট ৬০টি দেশে গেছেন ওরা । অন্যান্য কাজেই গেছেন । তবে মূল কাজ বাড়ি তৈরি । এখন অবসর কাটাতে এই পাহাড়িয়ায় এসেছেন ।

ওঁর মেয়ে আবার দুই অনাথ মেয়েকে দত্তক নিয়েছে । আমেরিকায় থাকে সে । মেয়ে দুটিকে আশ্রমে এত অযত্নে রেখেছিলো যে গায়ে **পুরু মাটির স্তর** জমে গিয়েছিলো ।

বড় বড় ছোবড়া , ঘসে ঘসে সেই মাটি ওদের গা থেকে তুলতে হয়েছে । অনাথ আশ্রমে এতই দুরবস্থা ছিলো ওদের ।

এখন ওরা ভালো আছে । এই মেয়েটির এক বন্ধু আবার প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয় । হাত ও পা তার অসাড় ।

সেই মানুষ নাকি একটি বড় পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে বদ্ধপরিকর । অনেক ট্রেনিং নিতে হয়েছে তাকে এইজন্য । তবুও মানুষটি শৃঙ্গ

আরোহণ করেই ছাড়বেন । তার অদম্য ইচ্ছা দেখে সরকার পক্ষও নাকি সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে ।

যেই মেয়েটি ঐ পোষ্যদের নিয়েছে তার নিজের থায়রয়েড অসুস্থ হয়ে পড়ায় গলায় অপারেশান করতে হয় । তাতে ভয়েস বক্স চোক্‌ড হয়ে গেছিলো । কথা বলতে খুবই কষ্ট হত । আগে খুব গান গাইতো । ভালো গান গাইতো । কিন্তু পরে সেই মেয়েকেই নতুন করে গান করতে শিখতে হয়েছে, গলার স্বর হারিয়ে যাওয়ায় । পরে দুই অনাথকে ঘর দিয়েছে । এখন তারাই ওর নয়নের মণি ।

আমারও এরকম কিছু পোলাপান আছে ভারতে যাদের আমি লালন পালন করি । সবাই মুম্বাইতে । ওদের আঁকা ছবি আমার কাছে আছে । ওদের আমি স্পনসর করি ।

ঢাকায় ; আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করা হত । নাম ছিলো নীহারবিন্দু । আমার ঠাকুর্দার বাবা সেই পত্রিকা বার করতেন । আমাদের বাড়ির বহু বৌ-ঝিদের লেখা ও আঁকা সেখানে বার হত । আমার কাছে এক কপি আছেও ।

লেখালেখির ট্যালেন্ট আমি ওখান থেকে পেয়েছি নাকি আমার মাতামহের ফার্স্ট কাজিন পদ্মভূষণ -তুষারকান্তি ঘোষের দিক থেকে তা আমি জানিনা । (একটু চালিয়াতি করে নিলাম ☺)

আমার দাদু হরেন সেন ও তুষারকান্তি ঘোষকে একইরকম দেখতে । কিন্তু প্রতিভা কীভাবে আসে, কোনদিক থেকে তা জিনের ম্যাপই জানে । হয়ত দুইদিক থেকেই এসেছে !

আমি ভালো আঁকি না । কিন্তু মুম্বাইবাসী আমার তিন ছেলেমেয়ে ভালো আঁকে । এটাও মজার ব্যাপার ।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলাম ইন্‌কা সভ্যতা দেখতে সেই মাচু পিক্‌চু । অনেক দূরে তো বটেই ! যাত্রার ক্লান্তি ধুয়ে গেলো খাড়া পাহাড়ের সবুজাভা দেখে । নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে, জিরাফের মতন গলা উঁচু করে পাহাড়গুলি । ভগ্ন স্তূপ । অশরীরি হাহাকার । লুপ্ত প্রজাতি ইন্‌কাদের আমি ওখানে দেখতে পেলাম । অনেকে বেশ বুড়ো । তামাকু সেবন করছে । যেমন বর্মিরা সবাই ধূমপান করে । মেয়েরাও । সেরকম । সোপানের পর সোপান, যেন ইন্‌কা সভ্যতা এই সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে এসেছে । **<u>নো স্মোকিং জোনে</u>** !

মানুষ তখনও সভ্য ছিলো এই ভাবনা ভালোলাগে । সমস্ত সভ্যতা জুড়ে এক নীরবতা । গাইডের কথার ফুলঝুরি কেবল শব্দভেদী বাণ হয়ে ঝরে পড়ে মাচুপিক্‌চুর বুকে । এই কাহিনী বলা যায়না । ইন্‌কা সভ্যতা স্পর্শকাতর তাই ছুঁয়ে দেখতে হয় ।

আমাদের শেষ গন্তব্য কূর্গ । আমি দুবার কূর্গে গিয়েছি ।

প্রথমবার এক জার্মান সাহেবের কফিবনে **<u>হোম স্টে</u>** করি । বনের মাঝে আমাদের কটেজ । **<u>ঐশ্বর্যরাই</u>** যেই সম্প্রদায়ের মেয়ে সেই একই সম্প্রদায়ের আরো একটি মেয়ে ওখানে শেফ্ প্লাস কেয়ারটেকার ।

সে আমাদের নানান উপাদেয় খানার যোগান দিতো ।

কটেজে একটি কাঁকড়া বিছে মারা হয় একদিন ।

সন্ধ্যায় জার্মান সাহেবের সাথে বসে বার্বিকিউ করা হত নিয়মিত । একদিন খ্রীস্টমাস্ ছিলো । সেদিন আমরা সবাই মাংস পুড়িয়ে ; সারারাত নেচে কুঁদে কাটালাম । খুব মজা হয়েছিলো ।

কূর্গে আছে এক মনাস্ট্রি । অনেকটা দার্জিলিং এর মতন জায়গাটা ।

তিব্বতী গুম্ফা আর কি ! রিফিউজিরা বাস করে সেখানে । ওখানে গিয়ে সারা মনাস্ট্রি ঘুরে দেখা হল ।

এক একজন লামা নির্বাক । হাতে পুঁথির মালা নিয়ে ক্রমাগত জপে চলেছেন । ডাকলেও শুনছেন না ।

একজন শুন্যে উঠে দাঁড়িয়ে আছেন । আমি তাড়াতাড়ি সরে গেলাম । নাহলে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের মতন আমার পায়ের ওপরে পড়লেই হয়েছে ! **টিনটিন ইন টিবেট মনে নেই ?**

সব দেখে শুনে শকুনি গ্রীবা বেঁকিয়ে বলে ওঠে ::: কিসের আশায় এরা এখানে পড়ে আছে কে জানে !

কূর্গের কাছে আছে তলাকাবেরী । কাবেরী নদীর উৎসস্থল ।

দক্ষিণীদের কাছে কাবেরী খুবই পূণ্যতোয়া, পাপনাশিনী ।

তলাকাবেরীতে আমি অবশ্যই পুজো দিইনি । তবে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানের পৈতে গোছের কিছু হচ্ছিলো সেটা পর্যবেক্ষণ করছিলাম ।

ডুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে যাই । হাতীদের ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে । বুনো হাতীগুলিকে মোটা কাঠের খাঁচায় রেখে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে । অন্যরা মজা দেখছে । সদ্য ধরে আনা হাতীরা খুব বেয়াড়া তাই উত্তম মধ্যম খাচ্ছে । পোষ মানা হাতীর দল, কাঠের স্তূপ থেকে বড় বড় লগ নিয়ে ট্রাকে তুলছে । বহু ছানাপোনারা এইসব দেখছে । কয়েকটি সারমেয়- নেড়ি প্রজাতির , তারা ঐসব বিশাল হাতীর পদতলে শুয়ে ঘুমাচ্ছে -পরম শান্তিতে । পিষে যাবার কোনো ভয় নেই ওদের !

দ্বিতীয়বার কূর্গে গিয়ে ক্লাব মহীন্দ্রার রিসর্টে ছিলাম । ওখান থেকে

কফি প্ল্যান্টেশান ঘুরে দেখি । সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা , লিপিবদ্ধ করা আছে ফাগুন কুয়াশা (হেমন্তের বিষ) বইতে ।

একবার পাহাড়ি মাসাজ নিই । অসম্ভব কদাকার এক কৃষ্ণভামিনী আমাকে প্রায় মারধোর দিয়ে দেয় মাসাজের নামে । ঘরে ঢুকতেই মারতে শুরু করে । বলে এটাই নাকি পাহাড়ি মাসাজ !

সমস্ত হাড়গোড় ভেঙে যায় আমার । শকুনির পাশার ছোঁয়ায় এখনও বেঁচে আছি ।

বাংলাদেশে নাকি আমাদের গ্রামের নাম ছিলো চাঁদপাশা । আমার পূর্বপুরুষ , প্রতাপাদিত্য রায়কে খাজনা দিতেন বলে শুনেছি বাবার কাছে । তাই পাশা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে । শকুনির পাশা , চাঁদপাশা , ভ্রমণ পাশা !

জীবনে তো অনেক ঘুরেছি । কতনা দেশ দেখলাম । তবুও হিমালয়ের নাম হৃদয়ের প্রতিটি কোণায় হিল্লোল তোলে ।

যেখানেই যাই না কেন ইউ -টিউবে রোজ একবার হিমালয় না দেখলে মন মানেনা । নেপাল, ভূটান, সিকিম, কুলু, মানালি এইসব ভীষণ মিস্ করি ।

ক্যানবেরাও তো পাহাড়িয়া বাঁশি । পাহাড়ি পাশা । তবুও হিমালয় পিছু ছাড়ে না ।

এখানে অনেক হিমালয়ের মানুষ থাকেন , বিশেষ করে নেপালি, ভূটিয়া । আমার সাথে বন্ধুত্ব আছে । ওদের কথাই নানান সুরে বেঁধেছি তুহিনরেখা বইতে ।

একটি হিমালয়ের মেয়ের সাধ ছিলো শৃঙ্গ জয় করার । কিন্তু মেয়ে বলে ওর পরিবার বাধা দেয় । এখানে এসে পাহাড়ে ওঠায় সাহায্য করে । অ্যান্টার্টিকায় ঘুরে এসেছে । আবার মেলবোর্নের কাছে একটি দ্বীপে ক্ষুদ্র পেঙ্গুইন দেখা যায় । পরী পেঙ্গুইন । ফেরী পেঙ্গুইন বলে ওদের । সেই জায়গাতেও মেয়েটি ঘুরে এসেছে বলে আমাকে বলেছে । ও একজন নারী বলে কিছুতে যেন ওর বাধা না পড়ে সেটাই জীবনে

করে দেখাতে চায় । ও একটা পরী পেঙ্গুইন ধরে এনেছে । আমি পুষেছি । আমার বাগানে যেমন ক্যাঙ্গারু আসে সেরকমই এখন সদ্য বসন্ত মাখা, বসন্তসেনা পরী পেঙ্গুইনটি আমার কাঁচের জানালায় এসে উঁকি দেয় । কোট কাচতে দেয় । মাঝে মাঝে । ড্রাই ওয়াশ না করালে ওর মনোমত হয়না !

শকুনি ওকে বেকড্ হেরিং অথবা টুনা মাছ খেতে দেয় । ও গোগ্রাসে খায় । আমি আধুনিক লজিক যুগে, ইতিহাস আর পরী পেঙ্গুইনের মাঝে দাঁড়িয়ে উপভোগ করি এক চিলতে রোদ্দুর । রৌদ্রছায়ায় ।

Wikipedia…..

The little penguin is the smallest species of penguin. It grows to an average of 33 cm (13 in) in height and 43 cm (17 in) in length, though specific measurements vary by subspecies. It is found on the coastlines of southern Australia and New Zealand, with possible records from Chile. In Australia, they are often called fairy penguins because of their small size. In New Zealand, they are more commonly known as little blue penguins or blue penguins owing to their slate-blue plumage.

*They are also known by their Maori (indigenous people of New Zealand) name***: korora-----**

শুনেছি যে জামশেদপুরের লোকেরা খুব উন্নাসিক । আই আই টিয়ানদের মতন । বিহার ও এখন ঝাড়খন্ডের আন্ডারে আসে এই ইস্পাত নগরী এবং ওরা মনে করে- ওরা বিহারীদের থেকে অনেক উন্নত । আন্তর্জালে বসে ,জামশেদপুরের কিছু বং-য়ের চালিয়াতি দেখে চাইনিজ ইনভেস্টরেরা ফোন করছে ওখানে !

-----হ্যালো হ্যালো জামশেদপুরে কী কী আছে ? সুন্দরী মেয়ে আছে? ওয়াইন ক্ষেত আছে ? সেক্সি লেডি আছে ? বিকিনি আছে ? জিগোলো আছে ? চালিয়াৎ যে আছে সে তো জানি ;ওদেরকে আমরা মার্কেটিং ইত্যাদিতে নেবো ।

তনুশ্রী দত্ত, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া , রতন টাটা , রুশি মোদির মতন মানুষের চারণভূমি যেই ইস্পাত নগরী ওখানে কিছু গাটারের ময়লাও আছে যারা এখন আন্তর্জালের দৌলতে বহু দেশে জাঁকিয়ে বসেছে । চিন্তা নেই -চীনারা এদের নিয়ে যাবে নিজ দেশের গার্বেজ পরিষ্কারের জন্য । চৈনিক মানুষ খুব ঝানু । জাপানীরা ওদের সেরকম পছন্দ করেনা বলে শুনেছি ।

আমার মা বিহারে বড় হয়েছেন । দাদু ,আগে বাংলাদেশের এক রাজবাড়ির -বন্দুকবাজ নায়েব ছিলেন- পরে নিজ ব্যবসা ফেঁদে বসেন । মায়েদের সবাইকে দাদু ছোরা খেলা , লাঠি খেলা ইত্যাদি শেখান । **মাধাদার আখড়াতে** । সমাজে দূর্বল বলে, মেয়েরা যাতে কোথাও হেরে না যায় । বেশ প্রগ্রেসিভ ছিলেন উনি বোঝাই যায় ।

লেখক দিব্যেন্দু পালিতের সাথে মায়েরা খেলাধূলো , আবৃত্তি কম্পিটিশান করতেন । ওঁর সহোদরা নবনীতা মাসি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ।

আমি রাঁচিতে গিয়েছি । ওখানে নানান ঝর্ণা , উঁচু উঁচু সব পাহাড় আর সবুজের খেলা দেখে খুব ভালোলাগতো । আমার এক মামা ওখানে হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশানে কাজ করতো । পরে আমেরিকায় চলে যায়, লেট সেভেন্টিজ্ নাগাদ । মামাদের সঙ্গে রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়ারদের মিশতে দিতো না ওখানে । রাশিয়া কমিউনিস্ট দেশ ছিলো বলে । মামারা আলাদা থাকতো ।

আর আমার বাবার মামা থাকতেন ডুরান্ডায় । উনি মেকনে কাজ করতেন । সেই প্রথম আমি অটো চড়েছিলাম । ডুরান্ডা যাবার সময় । সালটা সত্তরের শেষভাগে । এই বাবার বড়মামা এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সম্পাদকের বেয়াই হন ।

আগে এইসব জায়গা দেখে মনে হত এখানে লোকে বাস করে কী করে ? দমবন্ধ হয়ে আসেনা ? এখন আমার ছোট শহরই ভালোলাগে । সবথেকে বড় কথা এখানে উগ্রপন্থার কালো থাবা নেই । এখনো পর্যন্ত ।

আমার বর্তমান নিবাস ক্যানবেরাও ছোট শহর । মেলবোর্ন , সিডনি , পার্থ ইত্যাদি থেকে এলে একটু কোয়াইট লাগে । শান্ত , সমাহিত ।

এখানে প্রচুর দূতাবাস ও দূত আছেন বলে আপনার পড়শি যদি হন আলজেরিয়ার কোনো দূত অথবা ক্রোয়েশিয়ার দূত-জায়া -- স্বর্ণকেশী , পক্কবিম্বোষ্ঠী ,রমণীয় কোনো রমণী তাহলে অবাক হবেন না !

একটি ছেলে একদিন রাতে ঘুমিয়ে ছিলো । হঠাৎ ওর খাটটি নড়তে শুরু করে এবং উড়তে আরম্ভ করে । উড়তে উড়তে এসে পৌঁছায় পূর্ব জগতের কোনো এক দ্বীপে । দ্বীপটি ক্ষুদ্র । অপূর্ব মন্দির, ভগ্ন স্তূপ, বন, সৈকত আর পাহাড়ে সমৃদ্ধ । এখানে পাহাড়ে **জুম চাষ** হয় ----ধান ইত্যাদি দেখা যায় ।

সেই সবুজাভায় এসে নামে অ্যাফ্রিকার এই যুবক । খাট সমেত ।

ছেলেটি ওখানে কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ে পোর্টার ছিলো ।

খুবই দরিদ্র । স্বপ্ন দেখতো যে কোনো সে এক রূপকথার রাজ্যে চলে যাবে । কিন্তু কীভাবে ?

উড়ন্ত খাট ওকে নিয়ে আসে ক্ষুদ্র দ্বীপে । সেখানে জুমচাষী এক হলুদ বরণ মেয়ে ওকে বিয়ে করে তবে মেয়েটি ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় । মেয়েটিও একলা ছিলো । ক্ষেতে কাজ করে সময় কাটতো ।

এই দ্বীপে একটি কমিউনিটি আছে যারা সবাই সবার আত্মজ । কোনো বিপদ আপদ হলে একে ওপরকে সাহায্য করে ।কাজেই মেয়েটি ধর্ম বদলে সেই দলে যোগ দেয় ।

এখানে ঐ ধর্মের মানুষ নাকি **শত্রু আক্রমণ করলে সবাই মিলে আত্মহত্যা করে** । এটাই নিয়ম । তাই দ্বীপে কিছুটা আলাদা হয়েই আছে । দ্বীপের মন্দিরগুলি অদ্ভুত । চূড়াগুলি অনেকটা বড় বড় প্যাগোডার মতন বা বলা ভালো পাইন গাছের মতন । যেন মাথায় এক একটি পাইন গাছ বসানো । দৃষ্টিনন্দন । রং বেরং এর পোশাকে

সজ্জিত মানুষ জুমচাষ করে , ক্ষেতে । পাহাড়ের ঢালে । সীসার মতন কালো তরুণ অবাক চোখে দেখে । কতনা আনন্দে আছে এরা । নিজে তো সারাজীবন মালপত্র বয়ে কাটালো । এরা কী সুন্দর রং মেখে , ফুল মেখে, গানের ভেলায় ভাসছে । লালন পালন করছে একটি সবুজ চারাকে । ধানসিড়ি বেয়ে । নৌকোর বুকেই যেন এই গোপন অভিসার । তবুও নিজের দেশের কথা মনে হতেই বুকে অসম্ভব কষ্ট হত । কিন্তু ফেরার উপায় নেই । কারণ অর্থ নেই বিমানে করে যাবার আর খাটটি ভেঙে গেছে নিজে থেকেই ।

মেটাফোর নাকি জীবন রহস্য ? কোনটা ? পাঠক কী বলেন ?

অস্ট্রেলিয়া খুব সুন্দর একটি দ্বীপ । আরো অপরূপ নিউজিল্যান্ড । বালি, সুমাত্রা, জাভা এইসব আমরা প্রাচীন বাংলা কাব্যে পেয়েছি । সেগুলি এখন ভাস্বর , মনের আয়নায় ।

ধীরে ধীরে সব জায়গায় যাবো বলে ঠিক করেছি তবে বিহরণ হয়ত আর লিখবো না । সার্থক ভ্রমণ আমার তবে পুঁথি আর নয় ।

আই মাস্ট স্টপ রাইটিং বুক্স্ ।

জাপানও খুব সুন্দর জায়গা । আমি Lovely Village in Deep Snow: Shirakawa-go এখানে সবার আগে যেতে আগ্রহী । এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ভিলেজ । কবে যেতে পারবো জানিনা শুধু জানি যে **ইউ-টিউবে ভিডিও** দেখেও মনের সাধ মেটানো যাবে । কাজেই আপাততঃ মানস আর স্বপ্ন ভ্রমণ !!

একবার প্লেনে, এক সাহেবের স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেন ::: তুমি থার্ড ওয়ার্ল্ড স্লাম থেকে আসছো দেখছি । তোমার বাড়ির লোক খেতে পায় ?

ওর সঙ্গী সাহেব, চোখ ছোট করে বলে ওঠে ::: **<u>ডোন্ট বি ফাঙ্কি এলিজাবেথ !!</u>**

আজ , এই অপুষ্টিতে ভোগা স্লাম ডগের সবকটা মহাদেশ ঘোরা হয়ে গেছে , অ্যাফ্রিকা ছাড়া । তবে সেখানেও যাবো বিশেষ করে **কিলিমান্---------জারো !!**

মাচু পিচু (পিক্‌চু ; ইন্‌কা সভ্যতা) যখন প্রথম দুনিয়ার সামনে আসে তখন নাকি এক স্পিরিট একজন প্রত্নবিৎ-কে এই সভ্যতা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলো । জানিনা এই ঘটনা সত্য নাকি নিছক গল্প । হয়ত কিলিমান্----জারোতেও আমি এরকম কোনো স্পিরিটকে সাথী হিসেবে পাবো !

<u>শুধু পাঠক আর কোনোদিনই সেই সংবাদ পাবেন না ।।।</u>

THE END